দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনের বিরুদ্ধে শাসক দলের বিরোধিতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত — পৃঃ ১৩

নিবিড় সংশোধনে মমতা ব্যানার্জির এত আড়ষ্টতা, পাঁকে পড়ার দশা কেন? — পৃঃ ২৫

৭৮ বর্ষ, ১ সংখ্যা।। ১৮ আগস্ট, ২০২৫।। ১ ভাদ্র, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১ সংখ্যা, ১ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

১৮ আগস্ট - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

মমতা ব্যানার্জি কি আন্নাদুরাই আর অভিষেক ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো? জতুগৃহ তৃণমূল ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

মা দুর্গার এবার সরকারি গাড়িতে আগমন ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

পঞ্চ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চেহারাও বদলে যাবে ☐ ড. সঞ্জয় দ্বিবেদী ☐ ৮

ভুয়ো ভোটারের সমস্যা নিরসনে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ☐ কৌটিল্য ☐ ১০

ভাঙা পা থেকে ভাষা আন্দোলন : চতুর্থবার ক্ষমতার লড়াইয়ে মমতার বাঙ্গালি প্রীতির মুখোশ ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১১

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনীর বিরুদ্ধে শাসকদলের বিরোধিতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ☐ আনন্দ মোহন দাস ☐ ১৩

কাদের মমতা ব্যানার্জি 'বাঙ্গালি' বলছেন? এরাই তো কালনেমি সেজে হিন্দু ধর্মের অবমাননা করছে ☐ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ☐ ১৫

শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধ ☐ ড. রামানুজ গোস্বামী ☐ ১৭

ইয়াহিয়া থেকে ইউনুস ☐ শিতাংশু গুহ ☐ ১৮

অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বিতাড়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এনআরসি-র প্রয়োজন ☐ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ☐ ২৩

নিবিড় সংশোধনে মমতা ব্যানার্জির এত আড়ষ্ঠতা, পাঁকে পড়ার দশা কেন? ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৫

কলকাতা বি কে পাল পার্কে নৃত্যকালীমাতার পূজা ☐ সপ্তর্ষি ঘোষ ☐ ৩১

যৌগিক দৃষ্টিকোণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ☐ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ☐ ৩২

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একরাশ বেদনা ☐ সায়ন্তন বসু ☐ ৩৫

মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে নতুন দ্বিজাতি তত্ত্ব, বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালি ☐ বিশ্বপ্রিয় দাস ☐ ৩৮

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন : নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবিক ভারসাম্যের চালেঞ্জ ☐ উত্তম অধিকারী ☐ ৩৯

ভোটার তালিকা সংশোধনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তি কেন? ☐ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ☐ ৪৩

১৮৫৭ সালের মতো সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতে চেয়েছিলেন রাসবিহারী বসু ☐ প্রণব দত্ত মজুমদার ☐ ৪৬

আরজি কর থেকে ল' কলেজ : পশ্চিমবঙ্গ কি কিছু শিখেছে? ☐ বিপ্লব বিকাশ ☐ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

☐ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐

স্বস্তিকা তার যাত্রাপথের ৭৭তম বর্ষ অতিক্রম করে এই সংখ্যা থেকে ৭৮তম বর্ষে পদার্পণ করল। এই শুভলগ্নে স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

— স্বস্তিকা পরিবার

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
২৫ আগস্ট
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৫ আগস্ট
২০২৫

ভারত-আমেরিকা শুল্কযুদ্ধ

১৯৯৮ সালে ভারত পোখরানে পরীক্ষামূলক পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটালে আমেরিকা ভারতের ওপর আর্থিক অবরোধের কথা ঘোষণা করেছিল। সেইসময় দেশবাসী-সহ প্রবাসী ভারতীয়রা ভারত সরকারের পাশে থাকায় আমেরিকার অবরোধ ভারতের অর্থনীতিতে কোনোরূপ বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারেনি। এবার আবার ভারত-আমেরিকার শুল্কযুদ্ধ শুরু হয়েছে। নিঃসন্দেহে এবারও দেশবাসী-সহ সমগ্র বিশ্ব ভারতের পাশে থাকায় এবারও আমেরিকার আগ্রাসী সিদ্ধান্ত ভারতের ক্ষতি করতে পারবে না।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়ে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক

কথাটি উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে দাবি জানাইয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তাঁহার অভিযোগের নিশানা ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানের বহু নাগরিক বহু বৎসর যাবৎ এই রাজ্যে বসবাস করিতেছেন। তাঁহারা নাকি একাধিক স্থানে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা নাকি ভারতীয় জনতা পার্টিকেই ভোটদান করিয়া থাকেন। তাহা মনে করিয়াই তিনি তাহাদিগের নাম ভোটার তালিকা হইতে বাতিল করিবার দাবি জানাইয়াছিলেন। নির্বাচন কমিশনে তিনিই প্রথম অভিযোগ করিয়াছেন যে একই নম্বরের ভোটার পরিচয়পত্রধারী একাধিক ভোটারের নাম তালিকায় রহিয়াছে । মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ভারতের নির্বাচন কমিশন সদর্থক অর্থেই গ্রহণ করিয়াছে। এই বৎসরেই বিহার বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রাখিয়া বিহারেই নির্বাচন কমিশন প্রথম ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কার্য শুরু করিয়াছে। তাহারা স্বীকার করিয়াছেন একই নম্বরের পরিচয়পত্রধারী একাধিক ভোটারের অস্তিত্ব রহিয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশন বিহার রাজ্যে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম চিহ্নিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২২ লক্ষ ভোটারের মৃত্যু হইয়াছে, ৩৫ লক্ষ ভোটার অন্যত্র স্থানান্তরিত হইয়াছে, ৭ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিক ভোটকেন্দ্রে রহিয়াছে এবং ১ লক্ষ ভোটারের কোনোরূপ অস্তিত্বই নাই। স্বাভাবিকভাবেই এই বিশাল সংখ্যক ভোটারের নাম নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা হইতে বাদ দিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় হইল, নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনয়ন করিবার নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক বিরোধীরা সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহাকে তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক অভিসন্ধি বলিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে।

নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করিয়াছে, বিহারের পর ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হইবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। এই মর্মে ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে লিখিতভাবে অবগত করাইয়াছে। এই কার্য পরিচালনার জন্য দেড়হাজার বিএলও কর্মীর প্রশিক্ষণও সম্পন্ন করিয়াছে নির্বাচন কমিশন । ইহাতেই প্রমাদ গণিতেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহার অভিযোগ যে ব্যুমেরাং হইয়া যাইবে তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে ভুয়া ভোটার যে আসলে অনুপ্রবেশকারীরা তাহা দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশের অভিযোগ আজকের নহে, বামফ্রন্টের শাসনকালেই এই অভিযোগ উঠিয়াছে। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষভাগ হইতে বর্তমান শতকের প্রথমভাগের সংবাদপত্রগুলিতে নজর রাখিলেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। অনুপ্রবেশকারীদের বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম তাহাদের ভোটব্যাংকে পরিণত করিবার জন্য অবৈধভাবে ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড প্রদান করিয়াছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়ন করিতে কেন্দ্রের নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন। সেই সময় বিরোধী নেত্রীরূপে মমতা ব্যানার্জি ভোটার তালিকায় অনুপ্রবেশকারীদের নামের বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়াছিলেন। তিনি দাবি করিয়াছিলেন ভোটার তালিকা হইতে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিতে হইবে। ক্ষমতার কী বিষম লোভ যে তিনিই মুখ্যমন্ত্রী হইয়া সেই অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। তাহাদের সর্বপ্রকার পরিচয়পত্র প্রদান করিয়া 'বাঙ্গালি' বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। সমগ্র দেশে যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কার্য চলিতেছে তাহাতে পরিযায়ী শ্রমিকদের যে বৃহদংশ অনুপ্রবেশকারী তাহাও সামনে আসিয়াছে। তাহাদের পরিচয়পত্রও পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় যে বিশাল সংখ্যক ভুয়া ও অনুপ্রবেশকারীদের নাম রহিয়াছে তাহাও ধীরে ধীরে সামনে আসিতেছে। এই অনৈতিক কাজের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যের চারজন আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ করিয়াছে। এই নির্দেশ পালনে অসম্মত হইবার কারণে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে তলব করিয়াছে নির্বাচন কমিশন। খুবই দুঃখের বিষয় যে, নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকা সংশোধনের ন্যায় এক সাংবিধানিক কার্যে বাধা উৎপন্ন করিবার প্রবণতা যে দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক তাহা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বোধগম্য হইতেছে না।

সুভাষিতম্

যঃ স্বভাবো হি যস্যাস্তি স নিত্যং দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্।। (হিতোপদেশ)

যার যা স্বভাব হয়ে থাকে সে সবসময় সেরকমই আচরণ করে থাকে। কুকুরকে রাজা করে দিলেও সে কি জুতা চিবানো বন্ধ করবে?

মমতা ব্যানার্জি কি আন্নাদুরাই আর অভিষেক ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো?

জতুগৃহ তৃণমূল

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের আন্নাদুরাই হতে চাইছেন? আন্না অর্থে 'বড়ো ভাই' আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 'দিদি'। ১৯৬৭-৬৯ সিএন আন্নাদুরাই ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতা এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী। হিন্দি বিরোধিতায় তামিল ভাষার প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য। বাংলা (ভাষা), বাঙ্গালি আর ব্যানার্জি পরিবার। ব-এর মহামিলনে কাকে বাঁচাতে চান মুখ্যমন্ত্রী? কল্যাণ ব্যানার্জি-অভিষেক ব্যানার্জি-মহুয়া মৈত্রর 'রা' আলাদা? বাংলাভাষার আবেগ বেচে ২০২৬-এর ভোট জিততে চান তৃণমূলনেত্রী। তার বাংলাপ্রীতির নমুনা যদি তার 'কথাঞ্জলি' বইটি হয়, তাহলে ঈশ্বর এ ভাষাকে রক্ষা করুন। তা বাংলাভাষার জলাঞ্জলি। বিজেপিকে বাংলাভাষাবিরোধী, বাঙ্গালিবিরোধী ইত্যাদি বলা তৃণমূলনেত্রীর মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে। তার জন্য তিনি দেশবিরোধী হতে রাজি। কেবল বিজেপি বিরোধী হতে গিয়ে বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধি খুইয়ে ফেলেছেন। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সামনে বিজেপিকে করা কটু মন্তব্য শুধরে নিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। রাজ্যের মানুষ সিপিএমকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে।

তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির মতো আঞ্চলিক নেতা-নেত্রীরা লতার জাত। তার দল গড়ার ইতিহাস অনেকের জানা। তৃণমূলনেত্রী রাজনৈতিক জুয়ায় কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি আর এখন সিপিএমের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন। পুরনো কংগ্রেসি নেতারা বলতেন তার মস্তিষ্কে অক্সিজেন দেরিতে পৌঁছায় আর তিনিও টিউব লাইটের মতো দেরিতে জ্বলেন। রাজ্যজুড়ে বাংলাভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে রাজনীতি শুরু করেছেন ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের গুঁতোয় তা অচিরেই হারিয়ে যাবে। তিনি কতটা বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য আর কতটা পরিবারের তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বাংলা (ভাষা) আর ব্যানার্জির মতো দু'টি শব্দের তাৎপর্য তৃণমূলনেত্রীর কাছে আলাদা। একসময় সিপিএমকে ঠাট্টা করে 'কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মাড়োয়ারি)' বলা হতো। বহু অবাঙ্গালি ব্যবসায়ী জ্যোতি বসু, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাদের অনেকেই এখন তৃণমূলনেত্রীর কাছের মানুষ।

দলের ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। অনেকেই তাকে শিশু সাংসদ মনে করেন। সংসদীয় নেতা হয়ে সত্তরোর্ধ্ব সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় যে পদে একটানা চোদ্দ বছর ছ'মাস ছিলেন, তার বদলির কাজ করবেন অভিষেক ব্যানার্জি। তৃণমূলনেত্রীর নজর ঘোরানোর খেলায় বিরোধী রাজনীতিকরাও প্রভাবিত হন। রাজ্যে বিধানসভার ভোটের এখনও দশ মাস বাকি। ভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কু-রাজনীতি টিকবে বলে মনে হয় না। ভোটার তালিকায় তিনি যে জল ঢুকিয়েছেন, তা বেরোতে শুরু করলেই তার নকল বাঙ্গালির মুখোশ খসে পড়বে। তৃণমূলের জতুগৃহে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কুলো। সংসদে ভাঁড়ামো থেকে শুরু করে ভাষা সন্ত্রাসের জন্য তিনি কুখ্যাত। আর সবশেষে কুলোর বাতাস দিয়ে তাকে তৃণমূলি সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতক পদ থেকে তাড়ানো পর্যন্ত হয়েছে। ধর্মের ষাঁড়েদের এটাই ভবিতব্য। ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে। রাজ্যের ৪৫ শতাংশ ভোটার এখন তৃণমূলের জতুগৃহে বসবাস করেন। ২০২১-এর ফেব্রুয়ারিতে অভিষেক ব্যানার্জিকে নেতা বানিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। তার উত্তরসূরীও ঘোষণা করেছিলেন। অভিষেক বিরোধী সপ্তরথীর কথা বহুবার লেখা হয়েছে। অবস্থা পালটায়নি।

২০২৬-এর রাজ্য ভোটের দশ মাস আগে থেকে তৃণমূলনেত্রী তাঁত বোনার কাজ শুরু করেছেন। তাই কাপড় ধুয়ে অভিষেক বিরোধী বলে বিবেচিত কল্যাণ ব্যানার্জি বাদ পড়লেন। মুসলমান ভোট ভাগ করার চেষ্টা করলে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমও বাদ পড়বেন। তবে ধারে ও ভারে হাকিম কল্যাণবাবুর থেকে অনেক ওপরে। যেমন সুব্রত বক্সী। অভিষেক তার পছন্দের ব্যক্তি নয়। ভোটের আগে তাকেও ছুটি করে দেওয়া সম্ভব। রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের খেলায় অনেকটাই দুর্বল সিপিএম আর কংগ্রেস। পিঠ বাঁচাতে তারা তৃণমূলনেত্রীর ক্রাচ হয়েই কাজ করে থাকে। তবে তাদের নেতারা উলটো দাবি করেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর (অর্থাৎ মমতা ব্যানার্জির) সঙ্গে বিজেপির বোঝাপড়া রয়েছে। এই আজগুবি গল্প ভোটারের মন থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। পরপর দু'বার ৯৯ শতাংশ আসনে বামেদের জামানত জব্দ হয়ে গিয়েছে। বাম-কংগ্রেস সাবেকি দল। তৃণমূল বা বিজেপির মতো নবীন দলগুলির সঙ্গে তাদের এঁটে ওঠা সম্ভব নয়। তাই তৃণমূলি জতুগৃহের আগুনের আঁচ তাদের কাছে পৌঁছাবে না। এখন শুধু দেখার সে তাপ নিয়ে বিজেপি কতটা পরিবর্তন আনতে পারে। সেটাই এ রাজ্যে আগামীদিনে বিজেপির অগ্নিপরীক্ষা।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মা দুর্গার এবার সরকারি গাড়িতে আগমন

দরাজেষু দিদি,

আপনার তুলনা আপনিই। এই বছর পূজাকে আপনি একেবারে হট বানিয়ে দিলেন। ঠিকই ধরেছেন, ভাষার ঠিক থাকছে না। আনন্দে এটা হয়। আসলে এত এত টাকা ভাবা যায় না। আমি তো ভাবছি পঞ্জিকাকাররা যদি আগে জানতেন তবে লিখেই দিতেন, 'মা দুর্গার আগমন সরকারি গাড়িতে। আর গমন টোটোয়।' সেটাও দিদির পয়সায়।

এবার আপনি দিদি, পূজার ক্লাবগুলিকে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা সরকারি সহায়তা দেওয়া হবে বলে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে যখন ঘোষণা করছিলেন তখন আনন্দে আমার হৃদ্‌স্পন্দন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল। খুব সামলে নিয়েছি।

আপনি বলেছিলেন, 'খুশি তো?' প্রশ্নটা মোক্ষম কিন্তু দিদি। হাতে-হাতে কিছুমিছু দিয়ে খুশি করার রাজনীতিই তো আপনি করে আসছেন দিদি। তার ফলে বাজেটের মূল স্রোতে, অর্থাৎ পরিকাঠামো ও পরিষেবার বিধিবদ্ধ খাতে, বরাদ্দ কমই রয়ে যাচ্ছে, কখনো তা কমতে কমতে তলানিতে যাচ্ছে। রাজনীতি তৈরি করছে রাজস্ব ব্যয়ের নতুন নতুন খাত— অনুদান, ভরতুকি, কর মাফ, জামা-জুতো, মেলা- খেলা।

এসবের কারণটিও স্পষ্ট। সভা করে অনুদান ঘোষণা করলে দাতার চেহারাটা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। খুশি খুশি মুখটা। যিনি দিচ্ছেন, তিনি তো না-ও দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন। তিনি দিতে চাইলেন বলেই দিলেন, তা নিয়ে কারও সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকে না। এক দিকে না চাইতেই পাওয়ার আনন্দই আলাদা। কৃতজ্ঞতা প্লাস দাসত্বও এসে যায়। অন্য দিকে, পেয়েও হারানোর ভয়, এই দুই অনুভূতির জমিতে তৈরি হয় জনমোহিনী রাজনীতি। কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী, কৃষকবন্ধু, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্পগুলি আপনাকে ভোট এনেও দিয়েছে।

অনেকে প্রশ্ন তোলেন সরকারের কর্তব্য-সংস্কৃতি নিয়ে। বলেন, টাকার অভাবে প্রশাসনে বহু পদ শূন্য, সেচ বা রাস্তাঘাট তৈরির মতো জরুরি পরিকাঠামো নির্মাণ, মেরামতি স্থগিত। অগণিত সরকারি কর্মী তাঁদের নানা আইনি প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত। বকেয়া ডিএ দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ সরকারের কোমর ভেঙে যাবে। অন্যদিকে কি পূজার রোশনাইয়ে পাঁচশো কোটি টাকা খরচ করা উচিত? এসব প্রশ্ন করে বেআক্কেলরা। আরে বাবা! মানুষ যখন খারাপ রয়েছে তখন তো তাঁকে ফুর্তিতে রাখতে হয়। এটাই কেউ বোঝে না।

অনেকে আদালতেও গিয়েছে এই সব প্রশ্ন নিয়ে। কিন্তু উত্তর মেলেনি, মিলবেও না। জনমোহিনী রাজনীতির মজাই আলাদা। একবার বাঘের পিঠে উঠে পড়লে নামার উপায় নেই। বরং যে কোনো বাহুল্যকে সরকারি আধিকারিক হাতসাফাইয়ের খেলায় দেখিয়ে দেবেন 'একান্ত প্রয়োজন' বলে। অতএব অকারণ রাগারাগি, প্রতিবাদে সময় নষ্ট না করে মেনে নেওয়াই ভালো।

বকেয়া ডিএ দেওয়া যাচ্ছে না, কারণ সরকারের কোমর ভেঙে যাবে। অন্যদিকে কি পূজার রোশনাইয়ে পাঁচশো কোটি টাকা খরচ করা উচিত? এসব প্রশ্ন করে বেআক্কেলরা। আরে বাবা! মানুষ যখন খারাপ রয়েছে তখন তো তাঁকে ফুর্তিতে রাখতে হয়। এটাই কেউ বোঝে না।

দিদি, অনুদান যে ভালো কাজ করতে পারে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। ১৯৮২ সালে তামিলনাড়ুর একটি গ্রামে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এমজিআর শুরু করেছিলেন মিড-ডে মিল। পরে সেটাই প্রসারিত হয় সারা রাজ্যে। এটি তাঁর দলকে যেমন বিপুল জনসমর্থন দিয়েছিল, তেমনই শিশুর পুষ্টি ও পড়াশোনাতেও উন্নতি ঘটিয়েছিল, তা প্রমাণিত। ২০০৬ সালে নীতীশ কুমার 'মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সাইকেল প্রকল্প' শুরু করায় স্কুলের উপরের ক্লাসে ছাত্রী-সংখ্যা বেড়েছিল। এখন গোটা দেশে মিড ডে মিল চালু হয়েছে। এই রাজ্যে সেই টাকা চুরি হয় বটে কিন্তু উৎসবের টাকায় কোনো খামতি নেই।

আমি বলি কি দিদি, এবার মনে হয় এসব খরচ করে খুব কিছু হবে না। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু মুখে হাসি, বুকে রাগ নিয়ে বসে রয়েছে। আপনি অবশ্য ভালোই চাইছেন। সবাই উৎসবে মেতে থাকবেন। ভুলে যাবেন দুঃখ-কষ্ট। ভোট দিয়ে দেবেন। তবে এবার আর সেটা হবে কি না তা নিয়ে কিন্তু আমার মনে অনেক উদ্বেগ রয়েছে। আপনারও নিশ্চয়ই আছে। ও আচ্ছা, বুঝেছি দিদি, ওই জন্যই আপনি মেঘ না চাইতেই জল দিয়ে দিলেন। গত বছর বলেছিলেন ভোটের বছরে পূজা পিছু এক লক্ষ টাকা দেবেন। কিন্তু ম্যাজিক দেখালেন। কেউ যখন ভাবতেই পারেনি, তখন আপনি কেমন সুন্দর বলে দিলেন, এক লক্ষ দশ হাজার। উফ্! ভাবা যায় না। কী একটা মুহূর্ত। গোটা পশ্চিমবঙ্গ কেঁপে গেল। রানি রানি। রানি মাঈ কী জয় বলে ধ্বনি উঠতে পারত। ☐

অতিথি কলম

পঞ্চ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের চেহারাও বদলে যাবে

ড. সঞ্জয় দ্বিবেদী

ইতিহাসের কালচক্রে কোনো সাংস্কৃতিক সংগঠনের যাত্রা শতবর্ষ পূর্ণ করা কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এই যাত্রা একটি বীজের চারা থেকে বিরাট বটবৃক্ষে পরিণত হওয়া। সেক্ষেত্রে সেই সংগঠনের ভবিষ্যতে যাত্রার দিশা নিয়ে চর্চা হওয়া স্বাভাবিক। স্বতন্ত্রতার অমৃতকালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংকল্প ভবিষ্যৎ ভারত নির্মাণের সহযোগী হতে পারে। এই শতাব্দী বর্ষে সঙ্ঘ পঞ্চ পরিবর্তনের সংকল্প গ্রহণ নিয়েছে। এই পঞ্চ পরিবর্তন কী বিষয়? এর দ্বারা কীই-বা হতে পারে? তা জানা প্রয়োজন।

সঙ্ঘ মনে করে ব্যবস্থা পরিবর্তন তখনই সম্ভব যখন ভারতের ব্যবস্থা 'স্ব'-আধারিত হবে। 'স্ব'-আধারিত তন্ত্র গড়ে তোলা সহজ নয়। গান্ধীজী থেকে শুরু করে দেশের বহু মননশীল ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক নেতা 'স্ব'-এর কথা বলে গেছেন, কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা তাদের ভাবনাচিন্তাকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। সমাজ পরিবর্তন ছাড়া ব্যবস্থা পরিবর্তন সম্ভব নয়, তা সকলেই স্বীকার করেন। বৈচারিক বিভ্রান্তি এর সবচেয়ে বড়ো কারণ। আমরা আত্মবিস্মৃতির শিকার এবং আত্মদৈন্যতায় আবদ্ধ সমাজ। পরাধীনতার দীর্ঘ কালখণ্ডে এই দৈন্য গভীরতর হয় এবং তার ফলেই আমরা পথভ্রষ্ট হই। স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, লোকমান্য তিলক, গান্ধীজী, বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের সেই পথ প্রদর্শিত করেন, যে পথ অনুসরণ করে আমরা কুরীতিমুক্ত এক সক্ষম, আত্মনির্ভর ও স্বাভিমানী সমাজ হয়ে উঠতে পারব। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব এসব কিছু ভুলে যায়। সেই শুরুর সময়ও দীনদয়াল উপাধ্যায় এবং ড. রামমনোহর লোহিয়ার মতো নেতা ভারত আত্মাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির কাছে সেই ভাবনার কোনো অনুকূলতা ছিল না।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ শতাব্দী বর্ষে পঞ্চ পরিবর্তনের যে সংকল্প গ্রহণ করেছে, তা ভারতের চিতি এবং তার স্মৃতিকে জাগ্রত করার কাজ করবে। রাষ্ট্রীয় চেতনার স্তর বৃদ্ধির জন্য ১) নাগরিক কর্তব্য, ২) স্বদেশী, ৩) পরিবেশ সংরক্ষণ, ৪) সমরসতা এবং ৫) কুটুম্ব প্রবোধনের মতো ৫টি সংকল্প হলো পঞ্চ পরিবর্তনের সূত্র। এই বিষয়ে ভারত আত্মা পুরোপুরি জাগাতে এবং 'নতুন ভারত' নির্মাণ করার সংকল্প পরিলক্ষিত হয়।

নাগরিক কর্তব্যবোধ থেকে নবচেতনা সঞ্চার

যে কোনো দেশ এবং তার গণতন্ত্রের সাফল্য তার নাগরিকদের সহভাগিতা ও কর্তব্যবোধের দ্বারাই সার্থকতা লাভ করে। এক প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের নির্ভরযোগ্যতা তার নাগরিক চেতনার দ্বারাই পরিস্ফুট হয়। আইনের আধিক্য এবং তাকে অমান্য করার মানসিকতাও একই সঙ্গে দেখা যায়। নিজের দেশের মাটির প্রতি ভালোবাসা, অকৃত্রিম দেশভক্তিই সফল দেশের ভিত্তি। জাপানের মতো দেশের উদাহরণ দেওয়ার সময় আমাদের দেখা দরকার যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনা ও সহমর্মিতা ঠিক একজন জাপানির মতোই। এর প্রকৃত কী, যে কারণে আমাদের মহান পরম্পরা, জ্ঞানচর্চার পরও আমরা কেন এক উদাসীন এবং কোনো কোনো বিষয়ে অরাজক সমাজে বদলে যাচ্ছি। আইন ভাঙা একটা গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী আমরা সার্বজনিক স্থানে নোংরা ফেলতে এবং রাস্তায় লালবাতিকে উপেক্ষা করা থেকে বিরত হতেই পারছি না। এটা খুব ছোটো বিষয় বলে মনে হলেও বাস্তবে তা বিরাট। নির্বাচনে একশোতে একশো জনই ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে এটা অলীক কল্পনা। শিক্ষিত মানুষ বসবাসকারী শহরেও ৫০ শতাংশের উপরে উঠতেই পারছে না। এই তথ্য বুঝিয়ে দেয় আমাদের এখনও জাগ্রত নাগরিক বা সজাগ ভারতীয় হওয়া বাকি আছে। আইন মেনে চলা, সময় মতো কর দেওয়া, সামাজিক ও সমষ্টিগত সেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ, জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা প্রভৃতি অত্যন্ত জরুরি। একটি সুব্যবস্থিত সমাজের পরিচয় তার শুধু নিজের পরিবেশকে স্বচ্ছ ও সুন্দর বানানো নয়, বরং তাদের দেখে যেন বাকিরাও প্রভাবিত হয়। আমাদের মধ্যে অধিকারবোধ অনেক বেশি রয়েছে, কিন্তু কর্তব্যবোধ সে তুলনায় অনেক কম। যদিও সংবিধান আমাদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যেরও শিক্ষা দেয়। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ আমাদের নাগরিকতা ও সামাজিক আচরণের শিক্ষা দেয়। প্রশ্ন হলো যে, আমরা তা কতটা নিজের জীবনে তুলে ধরতে পারি।

স্বদেশীর মাধ্যমেই গড়ে উঠবে স্বাভিমানী ও আত্মনির্ভর ভারত

পঞ্চ পরিবর্তনের দ্বিতীয় সূত্র হলো স্বদেশী। স্বদেশী কেবলমাত্র আত্মনির্ভরতার বিষয় নয়, এটি রাষ্ট্রীয় স্বাভিমানেরও বিষয়। নিজের মাটির উপর দাঁড়িয়ে থেকে বিকাশ যাত্রাই হলো স্বদেশীর মূলমন্ত্র। বিনোবা ভাবে বলেন, 'স্বদেশীর অর্থ আত্মনির্ভরতা ও অহিংসা।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একে সদাচারের সঙ্গেও যুক্ত করে। যার অর্থ মিতব্যয়িতায় জীবনযাপন, কৃপণতায় নয়। স্বদেশী ভাবনা অত্যন্ত ব্যাপক। পরিবারে ভাষা, ভূষা, ভবন, ভ্রমণ, ভজন ও ভোজন এই ছয়টি বিষয়বস্তু আমাদের থাকা আবশ্যক। আমরা বিদেশি ভাষা বলে বিশ্বের সঙ্গে বার্তালাপ চালাতে পারি, কিন্তু নিজের পরিবারের মধ্যে মাতৃভাষা ব্যবহার করা উচিত। বিদেশি পোশাকে আপত্তি নেই, কিন্তু পারিবারিক মঙ্গলানুষ্ঠানে বা উৎসবে পারম্পরিক পোশাক পরিধান করা উচিত। ভজন, ভোজন, উপাসনা পদ্ধতি নিজস্ব হওয়া চাই। সারা পৃথিবী ঘুরে আসুন কিন্তু ভারতের তপোস্থল, তীর্থস্থান, বীরভূমিতেও আমাদের ভ্রমণ করা উচিত। আমাদের পরিবার পরিজন জানুক রাণাপ্রতাপ কে ছিলেন, চিতৌরগড় কোথায় আছে। ছত্রপতি শিবাজী কে ছিলেন, রায়গড় কেমনই-বা দেখতে। জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায় আছে। এইভাবে আমাদের পরিবারে ভারতীয়ত্বের দর্শন হওয়া

উচিত। সেখানে একটি ভারতীয় পরিবার বাস করে, এমনটা দেখে মনে হওয়া চাই। মহাপুরুষদের ছবি, নিজেদের ভাষায় নামের ফলক, স্বাগতম্ ইত্যাদি মঙ্গলশব্দ লেখা, সংস্কৃতির পরিচায়ক চিহ্ন রাখা। তুলসী চারা ছাড়াও পূজাঘরের একটি স্থানে ধর্মগ্রন্থ রাখা, তাতে আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থ যেমন গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি অবশ্যই রাখা। সেগুলি নিয়ম করে সপরিবারে বসে পাঠ করা। আমাদের জীবনযাত্রা আধুনিক হতে পারে কিন্তু পশ্চিমের অন্ধানুকরণ যেন না হয়। বাড়িতে কাজ করতে আসা মানুষদের প্রতি যেন সম্মানের দৃষ্টি থাকে। এমনই অনেক বিষয় যা নিয়ে আলোচনা, চর্চা হতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণ দ্বারাই হবে জীবনরক্ষা

প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান ভারতের মূল চিন্তন। আমাদের নদী, পাহাড়, বৃক্ষলতার মধ্যে ঈশ্বরের অনুভব করা আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরার অঙ্গ। প্রকৃতি ছাড়া মানবজীবনের কল্পনাই অসম্ভব। দূষণ আজ একটি বড়ো চিন্তার বিষয়। কোনো কিছুই স্বচ্ছ নেই। বাতাসও বিষাক্ত হয়ে গেছে। এজন্য আমরা আমাদের ভারতীয় চিন্তনে ফিরে যেতে হবে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে উপযুক্ত সম্পর্কই আমাদের বাঁচাতে পারে। বিশ্ব উষ্ণায়ণ আমাদের কাছে গভীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জল, বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করা, প্লাস্টিক মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার সঙ্গে যানবাহনের পরিমিত ব্যবহার করাও আবশ্যক। এয়ারকন্ডিশনারের ন্যূনতম ব্যবহার করা। বন-জঙ্গলের সংরক্ষণাদির মাধ্যমে সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। বাড়িতে গাছপালা লাগিয়ে হরিৎ গৃহের সংকল্প করা উচিত। আমরা যদি প্রকৃতিকে রক্ষা করি, তবে প্রকৃতিও আমাদের রক্ষা করবে।

সামাজিক সমরসতার দ্বারাই হয়ে উঠবে পৃথিবী সুন্দর

সামাজিক সমরসতা ছাড়া কোনো দেশেরই অগ্রগতি হতে পারে না। গুরু ঘাসীদাস বলেন, 'প্রত্যেক মানুষ সমান।' কিন্তু জাতপাত এই ধারণাকে বিষম করে তুলেছে। বহু প্রচেষ্টার পরেও আজ পর্যন্ত এই রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়নি। ভেদাভেদের কারণে আমাদের সমাজ বিভাজিত হয়ে রয়েছে, যার জন্য বিশ্বের দরবারে আমাদের এমন ছবি উপস্থাপন করা হয়েছে যেন আমরা মানবিক ব্যবহার করি না। গান্ধীজী বলেন, 'অস্পৃশ্যতা ঈশ্বর ও মানবতার প্রতি অপরাধ।' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৃতীয় সরসঙ্ঘচালক পূজনীয় বালাসাহেব দেওরস এই সমস্যাকে উদ্ধৃত করে বসন্ত ব্যাখ্যানমালায় বলেছেন, 'অস্পৃশ্যতা যদি পাপ না হয়, তবে পৃথিবীতে পাপ বলে কোনো কিছুই নেই, একে মূল থেকেই বিনষ্ট করা উচিত।' এমতাবস্থায় আমাদের বুঝতে হবে, যা কিছু বছরের পর বছর পরম্পরার নামে চলে আসছে, তা আমাদের ধর্ম নয়। অতীতের এই পেক্ষাপট কখনোই কোনো সভ্য সমাজের সমর্থন পেতে পারে না। আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রে এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। আমাদের ঋষি এবং গ্রন্থ রচয়িতাগণ সব বর্গ থেকেই উঠে এসেছেন। মহর্ষি বাল্মীকি এবং মহর্ষি বেদব্যাস এই পরম্পরা থেকেই এসেছেন। এসব ভেদাভেদ শাস্ত্রসম্মত নয়, এগুলি বিকৃতি। এর থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের এ বিষয়ে সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের আচার-ব্যবহার ও কথনের দ্বারা সমরসতার অগ্রদূত হতে হবে। প্রতিটি সমাজের সঙ্গে বার্তালাপ এবং মিলিত উদ্যোগে আমরা এক আদর্শ সমাজ গঠনে সহযোগী হতে পারি। এতে করেই সমাজ শক্তিশালী হবে। সমানতার ব্যবহার, বাক সংযম, পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার দ্বারা আমরা দূরত্ব কম করতে সমর্থ হব এবং বিভ্রান্তির জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারব। এর সঙ্গে আমাদের গ্রাম বা শহরের মন্দির, জলাশয়, শ্মশান সকলের জন্য সমানভাবে ব্যবহার্য হওয়া দরকার। এতে কোনো ভেদাভেদ চলবে না।

আমাদের শক্তি হলো পরিবার

আজকের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা আমাদের পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। ছোটো পরিবারে ভাগ হওয়া এবং একা হয়ে পড়া, বর্তমান সময়ে বিরাট সমস্যা। বাস্তবে কল্যাণকারী পরিবার তো সেটাই, যেখানে সবকিছু সংরক্ষণ, স্নেহ ও সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। যেখানে ছোটোদের প্রতি স্নেহ ও শিক্ষা, বড়োদের জন্য সম্মান এবং বৃদ্ধদের জন্য শ্রদ্ধা ও সেবা থাকে। পরিবার আমাদের শক্তি হয়ে উঠুক, তার জন্য পঞ্চ পরিবর্তনের মধ্যে বড়ো মন্ত্র হলো— পরিবার প্রবোধন। পরিবারের একটি পরম্পরা থাকে। আমরা তা বহন করে চলি এবং সংরক্ষিত করি। মূল্যবোধযুক্ত জীবনযাপনের দ্বারাই তা সম্ভব। পারিবারিক মূল্যবোধের দ্বারাই শিশুদের সংস্কার নির্মাণ হয়ে থাকে। শিশুরা যেমন দেখে তেমন শেখে এবং তেমনই আচরণ করে। পরিবারই সম্পর্কের বিস্তার ঘটায়। যেখানে স্বামী-স্ত্রী ও শিশু ছাড়া নিকট আত্মীয়েরাও যুক্ত। তাদের সুখে সুখী হওয়া বা দুঃখে দুঃখী হওয়া এবং সহানুভূতি জানানোর ফলেই আমরা মানুষ হয়ে উঠি। এজন্য ছোটোদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়স্বজনদের জন্যও সময় দেওয়া উচিত। কারণে-অকারণে অনুষ্ঠান, খাওয়াদাওয়া, উৎসবের মাধ্যমে এই সম্পর্ক প্রগাঢ় হয়ে ওঠে এবং তা সত্যিই খুব জরুরি।

খুব সাধারণ মনে হলেও পঞ্চ পরিবর্তনে সূত্রের মাধ্যমে ভারত আত্মার দর্শন লাভ হয়। এই সূত্র অবলম্বন করে আমরা এক সুন্দর ভারত নির্মাণের পথে অগ্রসর হতে পারব। সঙ্ঘের শতাব্দী বর্ষের জন্য গ্রহণ করা সংকল্প আমাদের এক সমাজ ও রাষ্ট্র রূপে গড়ে তোলার কাজ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর রামরাজ্যের দিশায় আমরা অগ্রসর হয়ে চলেছি। রামরাজ্যের মূল্যবোধ আমাদের জীবনে ও পরিবারে প্রতিফলিত হোক। এর ফলে এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী ভারত নির্মাণ হবে। আচরণের শুদ্ধতায় আসা পরিবর্তনই স্থায়িত্ব লাভ করে। এর দ্বারাই মন রামময় হবে এবং দেশে রামরাজ্য আসবে।

(লেখক ভোপালস্থিত মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা এবং সঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসঞ্চার বিভাগের আচার্য ও অধ্যক্ষ)

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

ভুয়ো ভোটারের সমস্যা নিরসনে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

ধরা যাক ১০০টা সেন্টারে সিভিল সার্ভিস মেইনসের পরীক্ষা হচ্ছে। ৯৫টা কেন্দ্রে ঠিকঠাক পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু বাকি ৫টি কেন্দ্রে চলছে চূড়ান্ত অনিয়ম। সেখানে কোনোরকম চেকিং চলছে না। একজনের পরীক্ষা আরেকজন দিয়ে যাচ্ছে। বই খুলে লেখা হচ্ছে। কোনো শিক্ষক বা অশিক্ষক কর্মচারী ঠিকভাবে গার্ড দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে অস্ত্র দেখিয়ে চলছে ভীতি প্রদর্শন। কোনো ছাত্র প্রতিবাদ করলে, তাঁকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়টি জানাজানি হলে ইউপিএসসি কি এই পরীক্ষা মেনে নেবে? এই পরীক্ষার ফল যেমন প্রকৃত, সফল পরীক্ষার্থীকে চয়ন করতে পারে না, তেমনই যদি ভোটার তালিকায় প্রকৃত নাগরিক না থেকে ভুয়ো নাগরিক থাকে, কিংবা ঠিকানা পালটে অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটার এবং মৃত ভোটারের অস্তিত্ব যদি ভোটার তালিকায় রয়ে যায়, তবে প্রকৃত, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিচ্ছবি হয় না নির্বাচনের ফল। ভোটার তালিকায় এই পরিমাণ অবৈধ, ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্ব প্রতিটি নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করে। যদি কোনো কেন্দ্রের ২০ শতাংশ ভোটার বিদেশি, অনুপ্রবেশকারী হয় এবং ১০ শতাংশ মৃত বা ঠিকানা পরিবর্তিত ভোটার হয় এবং কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বাক্সে তাদের সব ভোট জমা হয়, তাহলে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রকৃত নাগরিকের ভাগ ৭০ শতাংশে নেমে আসে। এই ভোটের ফল থেকে কি আদৌ জানা সম্ভব সরকারে ক্ষমতাসীন দল বা শাসক দলের পারফরম্যান্সের ব্যাপারে নাগরিকদের মতামত কী? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য, সড়ক, সেচ, জনস্বাস্থ্য, পুলিশ, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, পর্যটন, পরিবহণ, কর্মসংস্কৃতি, জনপরিষেবা, সামাজিক ন্যায়, প্রশাসনিক দুর্নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দেশের নাগরিকদের মতামত জানার জন্যই প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভোটার তালিকায় প্রচুর পরিমাণে জল মিশে থাকলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার গঠন কীভাবে সম্ভব? সরকারের থেকে কীভাবে মানুষ সঠিক পরিষেবা পাবে?

নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠু হওয়া উচিত শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলির প্রতি ন্যায়ের কারণে নয়। ক্ষমতাসীন দলেরও জানা উচিত তাদের প্রতি মানুষ কী ভাবছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালে ৩৫৬ ধারা জারি করে, বিপুল রিগিঙের মাধ্যমে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু পরের পাঁচ বছর গণতন্ত্রহীন পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস বুঝতে পারেনি যে তারা ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই ১৯৭৭ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই ৪৮ বছরে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি তারা। বামফ্রন্ট একটা সাড়ে তিন দশকের ব্যর্থ সরকার। প্রতিবার নির্বাচনী কারচুপি করে জিতে তারা ভাবতো মানুষ হয়তো তাদের গ্রহণ করছে। ৩৪ বছর ধরে তাদের এই কীর্তিকলাপের দরুন ২০১১-র পর দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যে সংঘটিত কোনো নির্বাচনে তারা দ্বিতীয় স্থানে আসতে পারেনি। রাজ্য প্রশাসন পরিচালনায় তৃণমূল কংগ্রেস আজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েও বিভিন্ন কারচুপি করে জেতার চেষ্টা করছে। ইতিহাস হয়তো এদেরও একদিন মুছে দেবে।

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের। যা হলো চিরস্থায়ী ক্ষতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বামপন্থী চিন্তাধারা প্রভাবিত ডেমোক্র্যাট, সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট বা লেবার পার্টি যখনই ক্ষমতায় আসে, তখনই নিজেদের নানা অপকর্ম ও অপদার্থতা ঢাকতে তাদের দেশে বিভিন্ন আফ্রিকান বা পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশের লোকজন ঢোকাতে শুরু করে। পশ্চিমি দেশগুলিতে অনুপ্রবেশকারী এইসব লোকজন হয় এই রাজনৈতিক দলগুলির কমিটেড বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভোটার। এইসব লোকজনের ভোটে তারা নিজেদের গদি সুরক্ষিত করে। কিন্তু এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ীভাবে ক্ষতি হয়ে গিয়েছে পশ্চিমি দেশগুলির। বিভিন্ন দেশের জনবিন্যাসের চরিত্র পরিবর্তন হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আজ ব্রিটেনে গ্রুমিং গ্যাং বা জার্মানি, ফ্রান্সে জেহাদি হত্যাকারীরা এমন অবস্থা তৈরি করেছে যে, স্থানীয় ইউরোপীয়রা এখন দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পালাচ্ছে। কেউ আমেরিকা, কেউ কানাডা, কেউ-বা অস্ট্রেলিয়া।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় ৩০ শতাংশের বেশি হলো শাসক দলের এই কমিটেড ভোটার। সমস্ত অবৈধ, ভুয়ো ভোট শাসক দলের ঝুলিতেই জমা হয়। এর ফলে একের পর এক নির্বাচনে নাগরিকদের প্রকৃত মতামতের ছবি পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল সব বিষয়ে ব্যর্থ হলেও গত ৪৮ বছর ধরে একের পর এক নির্বাচনে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান ভোটাররা তাদের পছন্দের দলকে এখানে ক্ষমতায় বসিয়ে গিয়েছে। শাসক দলের বিশ্বস্ত ভোটব্যাংক হওয়ার সুবাদে রাজ্যের বহু পাবলিক পলিসি বা সরকারি নীতিকে তারা আজ নিয়ন্ত্রণ করে। অবৈধ ও ভুয়ো ভোটারের অস্তিত্ব দেশে বা রাজ্যে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। ভোটার তালিকায় তাদের নাম থাকা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক।

তাই ভোটার তালিকা থেকে এই অনুপ্রবেশকারীদের নাম সরিয়ে নির্বাচনী সংস্কার ভীষণ জরুরি। আইন অনুযায়ী, একমাত্র প্রকৃত নাগরিকরাই তাঁদের সরকার নির্বাচন করবে। ভুয়ো ভোটারের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবিচল থেকে ভোটার তালিকা সংশোধন হলো কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের প্রথম পদক্ষেপ। তবে এটাই শেষ নয়। নির্বাচনী পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনতে আরও অনেক সংস্কার বাকি। ▫

ভাঙা পা থেকে ভাষা আন্দোলন : চতুর্থবার ক্ষমতার লড়াইয়ে মমতার বাঙ্গালি প্রীতির মুখোশ

সাধন কুমার পাল

ভাঙা পায়ের খেলা মমতা ব্যানার্জি ২০২১ সালে দেখিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সেই নাটক মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। ২০২৫ সালে আবার এক নতুন নাটক। বাঙ্গালি ও বাংলাভাষা রক্ষার নাটক। তিনি আসলে পশ্চিম বাংলাভাষা ও বাঙ্গালি নিয়ে কখনোই ভাবেন না। সেরকম ভাবলে শুধু তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে ৮২০০ বাংলা মাধ্যমের স্কুল বন্ধ হয়ে যেতো না। যেসব স্কুলে বাংলা শেখার কথা সেই বাঙ্গালিরা যাদের সামর্থ্য আছে তারা ইংরেজি মাধ্যম, হিন্দি মাধ্যমে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। তিনি যদি সত্যিই বাঙ্গালিদের কথা ভাবতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়ে অন্য রাজ্যে গিয়ে শুধু পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করার জন্য ভিড় জমাতো না। তিনি যদি বাংলাভাষা নিয়ে ভাবতেন তাহলে তিনি কেন হিন্দিতে ভাষণ দেন? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন ইংরেজিতে ভাষণ দেন? তিনি ভাষা আন্দোলন ঘোষণা করতে গিয়ে যে কটা বাক্য বলেছেন তার মধ্যে ৫০ শতাংশ হিন্দি। তিনি যদি সত্যিই বাংলা নিয়ে ভাবতেন তাহলে গুজরাট থেকে ইউসুফ পাঠানকে এনে পশ্চিমবঙ্গের এমপি বানাতেন না, বিহার থেকে কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহাদের ধরে এনে বঙ্গের প্রতিনিধি বানাতেন না। তিনি যদি সত্যিই বাংলা নিয়ে ভাবতেন তাহলে অসম থেকে সুস্মিতা দেবকে, দিল্লি থেকে সাগরিকা ঘোষকে নিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রতিনিধি বানাতেন না। গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফ্যালেইরোকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য করে পাঠাতেন না। পশ্চিমবঙ্গে কি বাংলাভাষী মানুষ নেই? এটা কি মমতার বাংলা ও বাঙ্গালি প্রীতির নিদর্শন?

২৬ হাজার বাংলা মাধ্যম স্কুলের শিক্ষকের চাকরি চলে গেছে। ৪২০০০ বাংলা মাধ্যমের প্রাথমিক স্কুলের চাকরি যায় যায় করছে। ইসলামপুরে রাজেশ, তাপস বাংলা শিক্ষকের দাবি করেছিল বলে পুলিশ তাদের গুলি করে মেরেছে। এরপরেও বলতে হবে মমতা ব্যানার্জি বাংলাভাষা ও বাঙ্গালিকে ভালোবাসেন। বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা হিন্দু বাঙ্গালিদের নিশ্চিতভাবে ভারতের নাগরিক হিসেবে এ রাজ্যে বসবাস করার জন্য ২০১৯ সালে কেন্দ্র সিএএ আইন এনেছিল। মমতা ব্যানার্জি সেই আইনের সবচাইতে বেশি বিরোধিতা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সেই নিয়ে প্রস্তাবও পাশ করিয়েছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে মমতা ব্যানার্জি চান না বাঙ্গালিরা এরাজ্যে নিশ্চিন্তে নিরাপদে বাস করুক। প্যালেস্টাইন নিয়ে সোচ্চার হলেও বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচার হলেও কোনোদিন একটি বাক্য মমতা ব্যানার্জি উচ্চারণ করেনি।

> **মমতা ব্যানার্জির রাজনীতির ধারা বলছে তিনি মুসলিম লিগের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। সেজন্যই তিনি হিন্দু বাঙ্গালির রক্ষাকবচ নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন এবং বাংলাদেশের স্লোগান 'জয় বাংলা' পশ্চিমবঙ্গের স্লোগানে পরিণত করেছেন।**

অসমে এনআরসি যখন হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গের যেসব মেয়ে অসমে বিয়ে হয়েছে, তাঁদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য নিজের বাপের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে এসে ডিএম অফিস, এসডিও অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ওদের চপ্পল ক্ষয় হয়ে গেছে তবুও তারা সেই ডকুমেন্ট পায়নি অর্থাৎ এই রাজ্যের প্রশাসন তাদেরকে কোনোভাবেই সহায়তা করেনি। যার ফলে অনেকেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে।

একটু মনে করুন বাঙ্গালির দুর্গাপুজাতেও মমতা ব্যানার্জির বাঙ্গালি বিরোধিতার নিদর্শন মনে পড়ে কিনা। ২০১৭ সালে দশমী পড়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বর। পরের দিন ১ অক্টোবর মহরম। মমতা ব্যানার্জি নেতৃত্বাধীন তৃণমূল সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, দশমীর দিন সন্ধে ৬টার পর থেকে ১ অক্টোবর পুরো দিন বিসর্জন বন্ধ থাকবে। ফের ২ থেকে ৪ অক্টোবর প্রতিমা নিরঞ্জন করা যাবে। বাঙ্গালির দুর্গাপূজাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য তিনি বিসর্জনের কার্নিভাল চালু করেছেন এবং তাতে মহরমের লাঠি খেলার মতো ইসলামি মজহবি ক্রিয়াকলাপের অনুমতি দিয়েছিলেন। এরকম অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাবে যার থেকে প্রমাণ হয় তিনি পশ্চিমবঙ্গের এবং বাঙ্গালির প্রতি বিশেষ করে হিন্দু বাঙ্গালির প্রতি কতটা নির্মম নির্দয়। সেই মমতা ব্যানার্জি এখন আবার নাটক শুরু করেছেন এই রাজ্যের ও বাঙ্গালি প্রীতির। এই নাটকের উদ্দেশ্য চতুর্থবার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন হওয়া।

আসলে মনে হয় মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসার জন্য যা করছেন জেনে বুঝেই করছেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে ক্ষমতায় আসার অর্থ হিন্দু বাঙ্গালির কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেওয়া। কারণ আজকে বিরোধীরা যা বলছে তিনি ২০০৫ সালে সেই একই কথা বলেছিলেন। তিনিই ২০০৫ সালে ভারতের

ফ ঃ ২

সংসদে অনুপ্রবেশের বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন।

২০০৫ সালের ৪ আগস্ট, তিনি লোকসভায় বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ এক বিপর্যয়ের রূপ নিয়েছে।' সাংবাদিকদের সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একটা ইস্যু তুলতে গিয়েছিলাম যে ইস্যু এই রাজ্যের মানুষকে খুব ভাবাচ্ছে। আগামী দিন রাজের মানুষ আর এখানে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনুপ্রবেশের ইস্যু নিয়ে রাজ্যপাল বলছেন যে এটা টাইম বোমার মতো। হোম মিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে সবাই বলছেন অনুপ্রবেশ বিষয়টা এমনও হয়ে গেছে যে ছাত্র যুব থেকে শুরু করে রাজ্যের মানুষের বাঁচার জায়গা নেই।'

মমতা ব্যানার্জি ভালো করেই জানেন সময়ের সঙ্গে সেই টাইম বোমা ভয়ংকর শক্তিশালী হয়েছে। কারণ তিনি ক্ষমতায় এসে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি। বরং তিনি দশ হাজার মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিয়ে এই অনুপ্রবেশকারীদের ভিত্তি আরও শক্ত করেছেন। শিমুলিয়া বা খাগড়াগড়ের ঘটনা এই কথাই প্রমাণ করে। বাংলাদেশের সরকারি মদতে হাজার হাজার রোহিঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই ভারতের অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতজুড়েই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু বিজেপি শাসিত রাজ্য নয় তামিলনাড়ু ও কেরালার মতো ইন্ডিজোটের আওতায় থাকা রাজ্যগুলিতেও এই ধড়পাকড় শুরু হয়েছে। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি মরিয়া হয়ে উঠেছেন এই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার জন্য। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, মমতা ব্যানার্জি কি একাত্তর সালের পূর্ব পাকিস্তানের মতো বাঙ্গালি আবেগ উসকে দিতে উঠে পড়ে লেগেছেন? একাত্তরের সেই বাঙ্গালি আবেগ ছিল পাকিস্তানের কবজা থেকে পূর্ববঙ্গকে আলাদা করার আন্দোলন। সেই ইতিহাসের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলতে হবে এবার মমতা ব্যানার্জির ভাষা আন্দোলন অবশ্যই 'ভারতের বিরুদ্ধে', ভারত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে পৃথক করার জন্য।

একাত্তরে বাঙ্গালি আবেগ তৈরি হয়েছিল, পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশের জন্ম ছিল যার পরিণাম। সেদিন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাভাষী মাত্রই সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু কিছুদিন বাদেই হিন্দু বাঙ্গালিরা বুঝলেন বিরাট ভুল হয়ে গেছে সেই আন্দোলনে নিজেদের উজাড় করে দিয়ে। সেই বাঙ্গালি আবেগ ছিল আসলে স্থানীয় মুসলমানদের ক্ষমতা দখলের লড়াই। সেই ক্ষমতা অর্জনের পর হিন্দুদের উপর শুরু হয়েছিল চরম অত্যাচার, যে অত্যাচার এখনো চলছে। সেই বাংলাদেশ এখন একটি কট্টর ইসলামি দেশ, যেখানে কোনো বাঙ্গালি আবেগ নেই। রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতি সেদেশে মুছে দেওয়া হচ্ছে।

মমতা ব্যানার্জি মুসলমান ভোটব্যাংকের সাহায্যে ক্ষমতায় টিকে থাকতে ঠিক একই ধরনের বাঙ্গালি আবেগ তৈরি করে গ্রেটার বাংলাদেশের নীলনকশা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। নির্বাচনে জেতার জন্য আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আর কোনো অস্ত্র নেই। ফলে কাল্পনিক বাঙ্গালি আবেগ উসকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে কাশ্মীর বানিয়ে হলেও তিনি ভোটে জিততে বদ্ধপরিকর। এহেন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের আগে বলছেন ভাষা আন্দোলন হবে। ভাবুন, ভালোভাবে ভাবুন, নিজের সমস্ত দুর্নীতি, কুকীর্তি, ব্যর্থতা, রাজ্যটাকে উচ্ছন্নে পাঠানোর ট্র্যাক রেকর্ড সবকিছুকে ঢেকে দেওয়ার জন্য নতুন সুযোগ 'বাংলাভাষা বিপন্ন' জিগির তোলা।

মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র চটকদারি রাজনীতি করে ভোটে জেতার জন্য অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তা করছেন এরকম মনে করার কারণ নেই, কেননা বিগত দিনে তিনি অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন যার থেকে বলা যায় তিনি সুস্পষ্টভাবেই অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের সহায়তা নিয়েই বছরের পর বছর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন বঙ্গের আইন সভায় ভোটাভুটি সম্পন্ন হয়। সেদিন রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত বাঙ্গালি হিন্দু রাজনৈতিক নেতা তাঁদের ঐক্য প্রদর্শন করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তারা ভোট দেন হিন্দু বাঙ্গালির পৃথক রাজ্যের পক্ষে। জন্ম নেয় পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতবর্ষের এই অঙ্গরাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস ঐতিহাসিক এই ২০ জুন তারিখটিকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী উঠেপড়ে লেগেছেন।

২০২১ সালে ২০ জুন রাজভবনে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালিত হবে এমন একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সে সময় রাজভবনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি লেখেন তিনি। লেখেন, 'আমি মর্মাহত যে আপনি ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠাদিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।' এই ধরনের অনুষ্ঠান না করার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এখনো বলে থাকেন ২০ জুন নাকি বঙ্গ বিভাগের দিন। মমতা ব্যানার্জির কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই যে, সেদিন বঙ্গ ভাগ হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি না হলে হিন্দুরা কোথায় যেতো?

সেদিন জিন্নার দল মুসলিম লিগও অখণ্ড বঙ্গের পক্ষে ছিল। মমতা ব্যানার্জির রাজনীতির ধারা বলছে তিনি মুসলিম লিগের সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। সেজন্যই তিনি হিন্দু বাঙ্গালির রক্ষাকবচ নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন এবং বাংলাদেশের স্লোগান 'জয় বাংলা' পশ্চিমবঙ্গের স্লোগানে পরিণত করেছেন।

শুধু 'জয় বাংলা' স্লোগান নয়, ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসের বিরোধিতা করে তিনি 'পহেলা বৈশাখ' পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন, সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের জন্য পৃথক রাজ্য সংগীত চালু করতে চাইছেন। তাঁর প্রত্যেকটা পদক্ষেপ ধাপে ধাপে বাংলাদেশের জেহাদি শক্তির স্বপ্নের বৃহত্তর বাংলাদেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

এখন শুধু মমতা ব্যানার্জির প্রয়োজন এই ভাষা আন্দোলনের নামে সেই আবুল বরকত, ওহিদুল ইসলাম, আব্দুস সামাদের মতো কয়েকজন শহিদ। তাহলেই কেল্লাফতে। সেরকম কিছু ঘটলে ২০২৬-এ মমতা ব্যানার্জিকে ক্ষমতায় আসা থেকে কেউ আটকাবে সেই সাধ্য কার? এজন্য যারা তৃণমূল করছেন, নাটুকে ভাষা আন্দোলনে যাচ্ছেন, তারা সাবধান থাকবেন। দু' চারটা লাশ ফেলে মমতা ব্যানার্জি যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করবেন না তার কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা নেই। □

ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনীর বিরুদ্ধে শাসকদলের বিরোধিতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

আনন্দ মোহন দাস

প্রসঙ্গত, ১৯৬০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ও ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৬ অনুসারে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো, প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা এবং সুনিশ্চিত করা যাতে কোনো অবৈধ ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত না হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ ভোটার তালিকার মাধ্যমে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করানো নির্বাচন কমিশনের মৌলিক ও সাংবিধানিক কর্তব্য। ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫০ অনুযায়ী নিম্নলিখিত তিনটি শর্ত পূরণ করলে তবেই ভোটাধিকার প্রাপ্ত করা যায়।

(১) ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, (২) বয়স ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব হতে হবে, (৩) কোনো স্থানে ন্যূনতম ৬ মাস বা তার অধিক সময়ের জন্য অধিবাসী হতে হবে।

দেশের নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫৫ ও ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫ থেকে ১১ (পার্ট ২) অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন পরিচালিত হয়। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ২০১৯ সালে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে একটি সংশোধনী এনেছে। এই সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর অবধি পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে যে সমস্ত সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ ও পার্শি ধর্মীয় অত্যাচারের কারণে ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তারা এই দেশের নাগরিকত্ব পাবেন। এই সংশোধনীটি বহুল প্রচারিত সিএএ (নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন) নামে পরিচিত। সুতরাং হিন্দুরা কোনোভাবেই অনুপ্রবেশকারী নয়। তাঁরা হলেন শরণার্থী।

স্বাভাবিকভাবেই বৈধ নাগরিক ছাড়া ভোটার তালিকায় কোনোরকম বিদেশি, মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম থাকা দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক ও বিপজ্জনক। এছাড়াও দেশের সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং অবৈধ ভোটারদের কোনোরকম ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ২০০৫ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়েও বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে সময়ে সময়ে ভোটার তালিকা বিশেষভাবে নিবিড় সংশোধন (SIR) করা অত্যন্ত আবশ্যক।

সম্প্রতি বিহারে ভোটার তালিকার SIR সম্পন্ন হয়ে গেল। এনডিএ জোট ছাড়া ইন্ডি জোটের বেশিরভাগ দলগুলি এসআইআর-এর তীব্র বিরোধিতা করে আলোচনার দাবিতে সংসদ অচল করে রেখেছিল। কয়েকটি বিরোধী দলের নেতা এবং বিদেশি মদতপুষ্ট কিছু এনজিও মিলে সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন দ্বারা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এমনকী আদালতে তারা বিহারে ভোটার তালিকার এসআইআর বন্ধ রাখার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সর্বোচ্চ আদালত সঙ্গত কারণেই নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ সংশোধনীর বিরুদ্ধে কোনো রকম স্থগিতাদেশ দেয়নি।

ইতিমধ্যে জানা গেছে বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (SIR) মাধ্যমে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে। এর মধ্যে ২২ লক্ষ ভোটারের মৃত্যু হয়েছে, ৩৫ লক্ষ ভোটার স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গেছেন, ৭ লক্ষ ভোটারের নাম একাধিক স্থানে রয়েছে এবং ১ লক্ষ ভোটারের কোনো অস্তিত্ব নেই। বিরোধীদের কাছে প্রশ্ন এই বিরাট সংখ্যক অবৈধ ভোটারের নাম কি তালিকায় থাকা উচিত? তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী? তাদের ভোটব্যাংক কি অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা? তাঁদের ভোট ব্যাংক কি ভূতুড়ে ও মৃত ভোটার? ভারতীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির এই ধরনের দেউলিয়াপনা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ভূমিকা লজ্জাজনক।

বলাবাহুল্য, এই ধরনের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর কাজ নতুন কিছু নয়। এর আগেও বিহারে ২০০৩ সালে এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০০২ সালে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী হয়েছে।

> “একসময় এই অবৈধ ভোটাররা রাজ্যে বামফ্রন্টের ভোটব্যাংক ছিল। সেই সময় বিরোধী দলে থাকাকালীন এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে লোকসভায় প্রতিবাদস্বরূপ তদানীন্তন ডেপুটি স্পিকারের টেবিলে কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনিই এই সমস্ত অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছেন।”

ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্যে ইতিপূর্বে ভোটার তালিকার ১৩টি বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (Special Intensive Revision) হয়েছে। সুতরাং বর্তমান নির্বাচন কমিশনের এটি কোনো মনগড়া বা বেআইনি সিদ্ধান্ত নয়। এই বিশেষ সংশোধনীর কাজে বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার) ও সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি (বিএলএ) বা বুথ লেভেল এজেন্ট হিসেবে থাকেন। সুতরাং কোনো পক্ষের এককভাবে কোনো অন্যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ থাকে না এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছাড়া কিছু নয়। দেশের স্বার্থে ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে, মৃত ও অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম থাকা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এই বিশেষ সংশোধনীতে মোটের ওপর পাঁচটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়।

(১) মৃত ভোটার, (২) স্থায়ীভাবে স্থান ত্যাগ করা ভোটার, (৩) একাধিক স্থানে ভোটার তালিকায় নাম থাকা, (৪) অস্তিত্বহীন ভোটার, (৫) অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা ভোটার।

এই সমস্ত অবৈধ ভোটারদের নাম স্বাভাবিকভাবেই ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। এরপর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর এক মাসের মধ্যে ERO (Electoral Registration Officer) এর কাছে অভিযোগ জানাবার সুযোগ থাকে। তারপরও সন্তুষ্ট না হলে DRO (District Returning Officer, i.e. DM) অভিযোগের নিষ্পত্তি করতে পারেন এবং সবশেষে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছেও অভিযোগ জানাবার সুযোগ থাকে। সুতরাং নির্বাচন কমিশনের এটি একটি ন্যায়সঙ্গত পক্ষপাতহীন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অবৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং শাসক তৃণমূলের অপপ্রচারে জনগণের বিভ্রান্ত বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। যদিও পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা তৈরি করতে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই নির্বাচন কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা উচিত।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার প্রস্তাবিত SIR (Special Intensive Revision) বা বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর বিরুদ্ধে শাসক তৃণমূল আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। শাসকদল রাজ্যে যেকোনো মূল্যে SIR যাতে চালু না হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। বিভিন্ন রকম মিথ্যা ন্যারেটিভ ছড়িয়ে সর্বত্র পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, বেকার সমস্যা, খুন, নারী ধর্ষণ ও শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঢাকতে এবং জনগণের দৃষ্টি ঘোরাতে SIR নিয়ে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে বিষোদ্গার করে চলেছে। এই রাজ্যে এখনো পর্যন্ত এসআইআর চালু না হলেও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসনিক সভায় ডিএমদের মাধ্যমে বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভোটার তালিকা থেকে কোনো নাম বাদ না দেওয়ার জন্য আগাম হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করছেন এবং কমিশনের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন।

এহেন শাসকদলের এসআইআর বিরোধিতার রহস্য উন্মোচন করতে কয়েকটি পরিসংখ্যানের দিকে নজর দেওয়া দরকার।

২০১১ সালের জনগণনায় (২০০১-২০১১) পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.৮৪ শতাংশ, অথচ জাতীয় হার ছিল ৭.৫৪ শতাংশ। ২০২৫ সালে রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও অনেক বেশি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় হারের চেয়ে রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ার মূল কারণ হলো, রাজ্যে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান ও মায়ানমারের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। সেজন্য এই রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেক বেশি। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদীয়া, মালদহ-সহ কয়েকটি সীমান্তবর্তী জেলায় ব্যাপক হারে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট ২০.৯৪ শতাংশ, হাসনাবাদে ১৭.৪৭ শতাংশ, মুর্শিদাবাদের রঘুনাথপুরে বৃদ্ধি ৩৭.৮২ শতাংশ, সামসেরগঞ্জে ৩৪.০৯ শতাংশ এবং সুতিতে ৩০.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তদনুসারে রাজ্যে অবৈধ ভোটারদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ সালে মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৯ লক্ষ। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার সময় পশ্চিমবঙ্গের মোট ভোটার ছিল ৫ কোটি ৬০ লক্ষ।

সুতরাং ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল অবধি বিগত পাঁচ বছরে ভোটার বেড়েছে ৫১ লক্ষ। অর্থাৎ ওই সময় রাজ্যে বছরে গড়ে ১০ লক্ষের অধিক ভোটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অনুসারে রাজ্যে ২০২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা হয়েছে ৭ কোটির মতো। কিন্তু কোন জাদুবলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে ২০২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটারের সংখ্যা হয়েছে ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ। সুতরাং রাজ্যের ভোটার তালিকায় কমপক্ষে ৯০ থেকে ৯৬ লক্ষের বেশি অবৈধ ভোটার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে মুখ্য বিরোধী দলের দাবি, অবৈধ ভোটারের সংখ্যাটি এক কোটি ছাড়িয়ে গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বিগত ১৪ বছর ক্ষমতায় থাকার সুবাদে শাসক তৃণমূলের বদান্যতায় বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গারা সকলেই আধার, ভোটার ও রেশন কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। সেজন্য তৃণমূল এসআইআর করার জন্য ডকুমেন্ট হিসেবে আধার, ভোটার ও রেশন কার্ড রাখার জোরালো দাবি তুলেছে। কারণ তারা বিলক্ষণ জানে, এই সমস্ত ভুয়ো ও অবৈধ ভোটারদের নাম কমিশন নির্ধারিত ডকুমেন্টের অভাবে তালিকা থেকে বাদ গেলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদলের ভরাডুবি অনিবার্য। তাই শাসক তৃণমূল শিবির গেল গেল রব তুলে সাংবিধানিক সংস্থা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বিষোদ্গার করে চলেছে।

একথা সত্য, একসময় এই অবৈধ ভোটাররা রাজ্যে বামফ্রন্টের ভোটব্যাংক ছিল। সেই সময় বিরোধী দলে থাকাকালীন এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দেওয়ার দাবিতে লোকসভায় প্রতিবাদস্বরূপ তদানীন্তন ডেপুটি স্পিকারের টেবিলে কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনিই এই সমস্ত অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ না দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হয়েছেন। কারণ এরাই তাঁর ভোটব্যাংক এবং নির্বাচনী সাফল্যের চাবিকাঠি। তাই পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন দ্বারা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীকে যেকোনো মূল্যে রুখে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। সেজন্য এই রাজ্যে ভোটার তালিকা শুদ্ধীকরণের কাজ নির্বাচন কমিশনের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও দেশের স্বার্থে পরিচ্ছন্ন ভোটার তালিকা নির্মাণের জন্য অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে অবিলম্বে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী বা SIR দরকার। □

কাদের মমতা ব্যানার্জি ‘বাঙ্গালি’ বলছেন?
এরাই তো কালনেমি সেজে হিন্দুধর্মের অবমাননা করছে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬ জুলাই, ২০২৫ হাস্যকরভাবে মেঠো রাজনীতিবিদের মতো রাস্তায় নেমে মিছিল ও শেষে সভা করে অন্য রাজ্যে অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের সমর্থন জানান। তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে একটা ইস্যু বানিয়েছেন, ‘বাংলাভাষীদের হয়রানি করা হচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে’। এটা সর্বৈব মিথ্যা।

প্রথমত, বাংলা বললেই কেউ বাঙ্গালি হয় না। দ্বিতীয়ত, এটা তিনি নিজেই খুব ভালো মতো জানেন যে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গরাজ্য এবং তাদের ভোটেই তাঁর এত বাড়বাড়ন্ত, এত ভোট প্রহসনের মাধ্যমে তাঁর ক্ষমতা দখল। রাজ্যে এত খারাপ অবস্থা মাৎস্যন্যায়ের সময় ছাড়া আর কখনো হয়নি। তর্ক করে লাভ নেই। তথ্য আছে মানুষের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশের শুরু জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারের। মমতা ব্যানার্জি নিজেই ১৯৯৮ সালে লোকসভায় অধ্যক্ষের উদ্দেশে কাগজ ছুঁড়ে মেরেছিলেন এর বিরুদ্ধে। সকলে দূরদর্শনের পর্দায় লাইভ দেখেছে। তিনি ক্ষমতায় এসে সেই চরম দেশদ্রোহিতাকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এখন বিহারের বিশেষ নিবিড় সংশোধন দেখে ভয় পাচ্ছেন।

এই অনুপ্রবেশকারীদের সারাদেশে ধরা হচ্ছে। মমতা অন্য রাজ্যে বাঙ্গালি হয়রানির অভিযোগে বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে সাধারণ বাঙ্গালিদের ভোটের জন্য ভিক্ষা চাইছেন। তারা বাংলাভাষী মুসলমান দেখলে সন্দেহ করবেনই যে এরা অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা বা বাংলাদেশি। উত্তরাখণ্ডে ‘অপারেশন কালনেমি’ মানে হিন্দু সাধুর ছদ্মবেশে রোহিঙ্গা জালিয়াতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২০০ জনেরও বেশি আটক হয়েছে এই অভিযানে। বাংলাদেশের এক প্রতারকও গ্রেপ্তার হয়েছে। দেরাদুনে রাস্তার ধারে সাধু বেশধারী রোহিঙ্গা ভণ্ডবাবা, গলায় গেরুয়া মালা পরা, সে দাবি করছিল কারও দিকে চাল ছুঁড়ে তার আয়ু বলে দিতে পারে। সে এই করে টাকা কামাতো। এসএসপির সামনে কেরামতি দেখাচ্ছিল। তাঁর দিকে চালের দানা ছুঁড়ে ভণ্ড দাবি করে যদি সেটা তাঁর কপালে লাগে তিনি ১০০ বছর বাঁচবেন। এসএসপি জিজ্ঞাসা করেন সে কত টাকা এইভাবে কামিয়েছে। অবশেষে ‘বাবাকে’ গ্রেপ্তার করা হয়। এটা ‘অপারেশন কালনেমি’র একটা উদাহরণ। দেরাদুন পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার কয়েক দিনে ১০০ জনের বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। এই অভিযান হিন্দু সাধু সেজে থাকা রোহিঙ্গা ভণ্ডদের চালাকি ফাঁস করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। উত্তরাখণ্ড জুড়েই এই ঘটনা ঘটেছে।

১১ জুলাই উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এই অভিযান শুরু করেন পবিত্র শ্রাবণ মাসে। তখন লক্ষ লক্ষ হিন্দু কাঁওরিয়া রাজ্যে আসেন। প্রতারকরা বেশিরভাগই উত্তরাখণ্ডের বাইরের। এরা বিপুল সংখ্যক ভক্তের সঙ্গে মিশে দেবভূমিতে প্রবেশ করে হিন্দুধর্মের সুনাম নষ্ট করে সহজে অর্থ উপার্জন করে। এরা বিশেষ করে মহিলাদের ঠকায়। অভিযোগ পেয়ে রাজ্য প্রশাসন এই অভিসন্ধি ধরে ফেলে।

অভিযান শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, ‘এরা শুধু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করছে না, সামাজিক সম্প্রীতি ও সনাতন ঐতিহ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে। যদি কোনো ব্যক্তিকে এই ধরনের কাজ করতে দেখা যায় তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।’

এযাবৎ দেরাদুনে, উধম সিংহ নগর ও হরিদ্বার জেলার প্রতিটায় ১০০ জনেরও বেশি করে গ্রেপ্তার হয়েছে। দেরাদুনে গ্রেপ্তার হওয়াদের কমপক্ষে এক ডজন প্রতারক রোহিঙ্গা মুসলমান, একজন বাংলাদেশি মুসলমানও রয়েছে। ২৬ বছরের বাংলাদেশি রুকম রাকাম, শাহ আলম নামে ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করছিল। এবং দেরাদুনের সাহসপুর এলাকা থেকে তাকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ এখন তাকে দেশ থেকে বহিষ্কারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আরেকজন কারি আব্দুল রেহমান, বিকাশ নগর এলাকায় কাজ করত এবং ভেলকি দেখিয়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা আদায় করত। এসএসপি ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এই মুসলমানরা হিন্দু পরিচয় দিয়ে মানুষকে প্রতারণা করছিল। 'তিনি আরও বলেন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের ৯০ শতাংশেরও বেশি অন্যান্য রাজ্যের, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও রাজস্থানের। তাদের কর্মকাণ্ডে উত্তরাখণ্ডের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।

অভিযান পরিচালনায় পুলিশ একাধিক দল গঠন করে প্রতারকদের শনাক্ত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্টেশন হাউস অফিসারদের উপর অর্পণ করে।

একবার শনাক্ত হওয়ার পর পুলিশের দল সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, সরকারি নথিপত্র চায়। না পেলে থানায় নিয়ে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা করা হয়। বেশিরভাগের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ১৭০ ধারায় অভিযোগ আনা হয়। আদালত সতর্ক করে জামিন দেয়। কিছুর বিরুদ্ধে কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অনুযায়ী আরও গুরুতর ধারায় অভিযোগ আনা হয়।

রাজ্যব্যাপী এই অভিযানের যুক্তি দিয়ে এসএসপি কালনেমি রাক্ষসের গল্প উল্লেখ করেন। সে ঋষির ছদ্মবেশে হনুমানকে বাধা দিয়েছিল লক্ষ্মণকে রক্ষা করার জন্য সঞ্জীবনী আনা থেকে। রাবণ কালনেমিকে হনুমানের জরুরি অভিযান দেরি করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কালনেমি হনুমানের যাওয়ার পথে নকল আশ্রম বানিয়ে তাকে বিশ্রাম করতে দেয়।

হনুমান কালনেমিকে হত্যা করে অভিযান সম্পন্ন করেন। এসএসপি সিংহ এই সাধুর ছদ্মবেশে থাকা ভণ্ডদের সঙ্গে কালনেমির তুলনা করেন। তাদেরও একইভাবে মোকাবিলা করতে হয়। অভিযানের শুরুতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী এই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করে বলেন, 'যেভাবে কালনেমি রাক্ষস অন্যদের প্রতারণা করার জন্য সাধুর রূপ ধারণ করেছিল, তেমনই এখন অনেক 'কালনেমি' দেশে সক্রিয়, হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশে অপরাধ করছে।' তিনি জোর দিয়ে বলেন রাজ্য সরকার ধর্মের নামে প্রতারণা করা কাউকে ছাড় দেবে না। একই সঙ্গে সরকার সনাতন ধর্মের মর্যাদা উঁচুতে তুলে রাখবে।

বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী আগমনের প্রেক্ষিতে উত্তরাখণ্ড সরকার শ্রাবণ মাস থেকে অক্টোবরের শেষের দিকে চারধাম যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপারেশন কালনেমি চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছে।

চারধামের অন্যতম বদ্রীনাথে পুলিশ ৬০০ জনেরও বেশি সাধুর নথিপত্র পরীক্ষা করার পর পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুই সন্দেহভাজন বাবাকে খুঁজে পেয়েছে, যা অবিরাম প্রচেষ্টার সাফল্য তুলে ধরে। কেউ ভাবতে পারেন কেন এই ধরনের উদ্যোগ মূলত সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর নজর দেওয়া হচ্ছে? কারণ পির বাবা বা চার্চের ফাদারদের মধ্যেও প্রতারক আছে।

প্রথমত, এই উদ্যোগ উপাসনা পদ্ধতিভিত্তিক নয়। উত্তরাখণ্ডের স্থানীয় প্রেক্ষাপট এবং চলতি তীর্থযাত্রার মরসুম মাথায় রেখে ভণ্ড সাধুদের উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক নয়। তাই আব্রাহামিক রিলিজিয়নের তুলনায় প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। ফলে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ শুদ্ধির জন্য সরকারি সহায়তা প্রয়োজন।

হিন্দু ধর্মীয় নেতারা সবসময় এই ধরনের উদ্যোগ সমর্থন করেছেন, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একই ধরনের পদক্ষেপ নিতে গেলে প্রায়ই বাধার মুখে পড়ছে। সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষার নামে এটা করা হয়। অপারেশন কালনেমি শুরুর পর মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, 'আমি রাজ্যের প্রবীণ সাধুদের সঙ্গে দেখা করে অভিযানের সাফল্যের জন্য তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েছি, তাঁদের সহযোগিতা চেয়েছি।' মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী যতীন্দ্রানন্দ গিরি মহারাজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরকারি বাসভবনে দেখা করে অভিযানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই উদ্যোগ সমর্থন করে অখিল ভারতীয় আখড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত রবীন্দ্র পুরী মহারাজ বলেন, 'ভুয়া সাধুরা কাঁওরিয়াদের কাছ থেকে টাকা চায়, প্রতারণা করে এবং যারা টাকা দিতে অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে; এই লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

এই ধরনের অভিযানের সময় পুলিশ কীভাবে ধর্মীয় সংবেদনশীলতার সম্মান নিশ্চিত করে তা জানতে চাইলে, এসএসপি সিংহ বলেন যে তারা এখনো পর্যন্ত এই ধরনের কোনো অভিযোগ পাননি, 'যখনই আমরা কোনো সাধুদের পরিচয় জানতে চেয়েছি, তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য দেখিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারাও আমাদের সমর্থন করেছেন, তারা বিশ্বাস করে এই প্রতারকরা হিন্দুধর্মকে কলঙ্কিত করে। তাদের গ্রেপ্তার করা হয় হিন্দুধর্মের স্বার্থে।'

যে ধর্মের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব নেই, সেখানে পুলিশ কীভাবে প্রকৃত সাধু ও প্রতারকদের মধ্যে পার্থক্য করে, সে সম্পর্কে এসএসপি সিংহ ব্যাখ্যা করেন যে হিন্দুধর্মের কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান না থাকলেও, এর বেশ কয়েকটি সম্প্রদায়, ঐতিহ্য ও আশ্রম রয়েছে, 'আমরা সন্দেহভাজন ব্যক্তির বংশ জিজ্ঞাসা করি— সে কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়, ঐতিহ্য, আশ্রম বা মঠের কিনা। যখন তারা তাদের পশ্চাদপট ও ধর্মানুশীলনের নাম এবং ব্যাখ্যা করতে পারে, তখন আমরা তাদের যথার্থ বলে মনে করি। যদি তারা তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আমরা ব্যবস্থা নিই।'

অপারেশন কালনেমি সফল হচ্ছে। এটা এক সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এর একাধিক উপযোগিতা আছে। এটা শুধু জনসাধারণকে প্রতারিত হওয়া থেকে বাঁচায় না, হিন্দুধর্মের যাথার্থ ও সম্মানজনক ভাবমূর্তিও তুলে ধরে। আশা করা হচ্ছে যে, অন্যান্য রাজ্যগুলিও নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই সকল প্রতারকদের বিরুদ্ধে একই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করবে। □

শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধ

ড. রামানুজ গোস্বামী

শিক্ষায় আধ্যাত্মিকতার প্রাসঙ্গিকতা সত্যই অনস্বীকার্য। আধ্যাত্মিকতাই মানুষকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তোলে। এমন মানুষেরাই পারেন সমাজের কল্যাণ করতে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধ বিহীন ব্যক্তি যদি উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চপদাধিকারী কিংবা অতিশয় ধনীও হয়, তবুও সে এই সমাজ তথা পৃথিবীর পক্ষে বিপজ্জনক। ভারতের দুই সুপ্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতে এই সত্যই বর্ণিত হয়েছে। অধ্যাত্ম ও মূল্যবোধের শিক্ষা একজন সাধারণ মানুষকে করে তোলে অসাধারণ। পাশাপাশি এগুলির অভাবে মানুষকে নিশ্চিত রূপেই বিনাশের দিকেই এগিয়ে যেতে হয়। স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি ও ত্রিভুবনবিজয়ী তথা অতুলনীয় বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও রাবণকে সমূলে বিনষ্ট হতে হয়েছিল। সেইরকমই অর্থ, ক্ষমতা, কৌলীন্য প্রভৃতি সর্বদিকে অতি উচ্চ স্থানে বিরাজ করলেও শেষ পর্যন্ত কিন্তু কৌরবকুলকে পরাজিতই হতে হয়েছিল। এই কারণে জীবনে চলার পথে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধই মানুষকে সঠিক দিশা দেখাতে পারে। এর অভাবে অন্ধকারে পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হতে হয়। তাই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধই হলো জীবনেব মহত্তম সম্পদ, যার প্রভাবে জীবন হয় সার্থক।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সাধারণ মানবিক গুণাবলী থেকে অনেক উঁচুতে অবস্থিত। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিংবা কোনো প্রলোভনে সাধারণ মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হলেও হতে পারে--- কিন্তু আধ্যাত্মিকতা এমনই এক শক্তি যা অটল ও অবিচল। জীবনের কোনো পরিস্থিতিতেই তার এতটুকুও বিচ্যুতি ঘটে না। তাই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই দরকার আধ্যাত্মিক মূল্যবোধেরই শিক্ষা।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে এক বিরাট নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে। ধ্বংসাত্মক রাজনীতির পাশাপাশি এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহেলার কারণেই এই পরিণতি ঘটেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধের অনুপস্থিতির কারণেই আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘটছে নানা অপরাধমূলক ঘটনা। শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে চলেছে কলঙ্কিত। যে হিন্দুধর্মে, যে ভারতে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনা করা হয়, সেখানে নারী-নির্যাতন রীতিমতো আশ্চর্যের বিষয়। বহুক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে থাকে যে, পুত্র-কন্যাদের দুর্ব্যবহারের কারণে বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে নিজেদের শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত খুইয়ে চরম লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হয়ে পথে আশ্রয় নিতে হয়। আসলে এই সবই হলো সামাজিক অবক্ষয়ের অনিবার্য পরিণতি। বর্তমানে যে প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে, তা আদর্শ মানুষ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একেবারেই উপযুক্ত নয়।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বস্তরে শিক্ষার্থীরা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার সঙ্গে পরিচিত হলেও আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের পাঠ প্রায় শেখে না বললেই চলে। তাই নামি-দামি প্রতিষ্ঠান থেকে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি লাভ করলেও জীবনে চলার পথে কীভাবে একজন ভালো ম্যানেজার হওয়া যায়, তার শিক্ষা শিক্ষার্থীরা পায় না। এই কারণেই প্রাচুর্য থাকলেও জীবন অশান্তিতে ভরে ওঠে, সম্পর্কের বিনাশ ঘটে, মনুষ্যত্বের ক্রমাবনতিতে অমৃতের সন্তান ক্রমশ পশুতে এবং তারপর ধীরে ধীরে দানবে পরিণত হয়। আজ সমাজে বেড়ে চলেছে অপরাধপ্রবণতা। জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দ তথা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে প্রতি ক্ষণে। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি হলো পরিবারের একক। কয়েকজন ব্যক্তি নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। পরিবারগুলিই গঠন করে থাকে সমাজব্যবস্থা। তাই ব্যক্তি যদি আধ্যাত্মিকতা তথা মূল্যবোধ সম্পর্ক না হয়, তবে সম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে।

পশ্চিমি সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণে উন্মত্ত হয়ে আজ ভারতীয়দের এক খুব বড়ো অংশই আজ ধর্মীয় চেতনা তথা নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছে। এর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সমাজে এমন বহু ঘটনা ঘটছে, যা একেবারেই কাম্য নয়। মানুষ বাহ্যিক সৌন্দর্য বজায় রাখতে ব্যবহার করে নানাবিধ প্রসাধন-সামগ্রী। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য যা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মান ও হুঁশ সম্পন্ন করে তোলে তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এই অন্তরে সৌন্দর্য বজায় রাখতে দরকার হয় মূল্যবোধের। মূল্যবোধ না থাকলে জীবনের মূল্য বোঝা যায় না। ফলে জীবন হয়ে পড়ে মূল্যহীন। আধ্যাত্মিকতার অর্থ কিন্তু শুধুমাত্র মন্দিরে যাওয়া দেব- দেবীর পূজার্চনা করাই নয়, বরং আধ্যাত্মিকতা এক অতি বিস্তৃত পরিসর বা ক্ষেত্র যা পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উত্তরণ ঘটায়। মানুষ থেকে আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার যাত্রাপথেরই অপর নাম হলো আধ্যাত্মিকতা। তাই শিক্ষার্থীদের সবরকম ভাবে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধ সম্পর্কিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার।

এটা বোঝা দরকার যে, আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধবিহীন শিক্ষায় তৈরি হবে দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বার্থপর, হিংস্র ও দানবিক মনোভাবাপন্ন একদল শিক্ষিত তথা রুচিবোধহীন ব্যক্তি যারা আসলে মূর্তিমান শয়তান ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বামীজী বলেছিলেন যে, 'Education is the manifestation of perfection already in man.' এই শিক্ষা হলো তা পূর্ণত্বের দিকে যাত্রা। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ আচরণ কেমন হবে তারই পাঠ দেয় মূল্যবোধ। আজ ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজকে গ্রাস করছে। ফল খুবই বিপজ্জনক। তাই, জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে হলে আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক, ভারতীয় মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। □

ইয়াহিয়া থেকে ইউনুস

শিতাংশু গুহ

ভিডিয়োটা দেখলাম। না, পুরোটা দেখার মতো নয়, দেখা যায় না। মধ্যযুগীয় বর্বরতা, ভারী পাথর মেরে কাউকে হত্যা করা। নির্মম, নিষ্ঠুর। কীভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, বাংলাদেশে সবাই সম্ভব। আওয়ামি লিগ আমলে আমরা দর্জি বিশ্বজিৎ হত্যা দেখেছিলাম। বিশ্বজিৎ বলেছিল, আমি হিন্দু, বিএনপি নয়। এবার নিহত হাফিজ কী বলেছিল জানি না। তবে এ মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণার। ৯ জুলাই মিটফোর্টে ব্যবসায়ী হাফিজকে (৩৯) নৃশংসভাবে হত্যা করেছে যুবদল-ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। আবার সেই মব ভায়লেন্স। যুবদল রজব আলি পিন্টু এবং সাবাহ করিম লাকিকে এজন্যে বহিষ্কার করেছে। আজকাল অনেক ঘটনায় বিএনপি'র নাম আসছে, এটিও কি নিখুঁত পরিকল্পনা?

বুঝলাম, শেখ হাসিনা স্বৈরাচারী, যদি তাই হয়, তাহলে ড. ইউনুস স্বৈরাচারীর বাপ। শেখ হাসিনার আমলে ১৬ বছরে ২০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছিল, ড. ইউনুসের আমলে ১০ মাসে ২০ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, এটি রেকর্ড। শেখ হাসিনা দেশান্তরি ড. ইউনুসের শেষ জীবনটা জেলে কাটবে কিনা কে জানে? দেশে যেভাবে হত্যা, ধর্ষণ চলছে তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে। মব ভায়োলেন্সকে এঁরা 'মব জাস্টিস' বলে বৈধতা দিচ্ছে। সেনাবাহিনী বারবার বলছে, 'মব' সহ্য করা হবে না, কিন্তু ওয়াকারুজ্জামানের অসীম ধৈর্য, তিনি নীরবে সবকিছু সহ্য করছেন। জেনারেল সাহেব দেশ সহ্য করা হবে না, কিন্তু ওয়াকারুজ্জামানের অসীম ধৈর্য্য, তিনি নীরবে সবকিছু সহ্য করছেন। জেনারেল সাহেব, দেশ যেভাবে চলছে তাতে হয়তো একদিন যাকে হেলিকপ্টারে করে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে আবার সসম্মানে প্লেনে করে দেশে আনতে হতে পারে।

ইয়াহিয়া থেকে ইউনুস। ইয়াহিয়ার আমলের সঙ্গে ড. ইউনুসের আমলের বিস্তর মিল। বাংলাদেশে এখনকার সময়টা ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে-জুনের মতো। রাজাকার, পাকিস্তানিরা হত্যা-ধর্ষণ- অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। টার্গেট করে হিন্দুদের ও আওয়ামি লিগ সমর্থকদের বেছে বেছে মারছিল। ভুলে গেলে চলবে না, এরপরও ডিসেম্বর এসেছিল। এবারও যে ডিসেম্বর আসবে না তা কি কে কেউ বলতে পারে? তেমন কিছু ঘটলে, ভারত আকাশপথটা কিছু সময়ের জন্যে বন্ধ করে দিলে পালাবার পথও থাকবে না। একটি সাবমেরিন অবশ্য আছে, সেটি রেডি রাইখেন। তাতেও সমস্যা আছে, ভারতীয় নৌবাহিনী না চাইলে পালাতে পারবেন না। তাই মোদীকে 'হাড়িভাঙা আম' পাঠিয়ে পালানোর রাস্তাটা অন্তত খোলা রাখবেন।

ঐক্য পরিষদ প্রেস কনফারেন্স করে বলেছে, সংখ্যালঘুদের ওপর ৩৩০ দিনে ২৫০০ সহিংস ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রায় সাড়ে ৭টি ঘটনা ঘটেছে। অস্বীকার করতে চান, করেন। তবে এও সত্য, অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ হয় না। জবাব দিতে হবে বই কী। অর্থনীতিবিদ আবুল বারাকাত গ্রেপ্তার হয়েছেন। বাঁশখালীর পল্লী চিকিৎসক প্রবীর চৌধুরী এবং সিলেটের রশিদপুরে চা-শ্রমিক রামজিৎ দাস গ্রেপ্তার হয়েছেন ধর্ম-অবমাননার অভিযোগে। প্রথম আলোর মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার অভিযোগে মামলা হয়েছে। আপনার ধর্ম উপদেষ্টা বলেছেন, ড. ইউনুসের দাড়ি রাখা উচিত। ক্ষমতায় থাকার জন্যে দাড়ি রাখতে আপনার আপত্তি থাকার কথা নয়?

ভারতের এক সময়ের রাষ্ট্রপতি আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, একটি দেশ ধ্বংস করতে পরমাণু লাগে না, লাগে কিছু অসভ্য, বর্বর, মূর্খ, সন্ত্রাসী হিংস্র জন্তু। ড. ইউনুস, এরাই তো আপনার শক্তি। শেষ বয়সে দেশকে ধ্বংস করতে আপনি দায়িত্ব নিয়েছেন। ভুট্টো বলেছিল, বাঙ্গালিরা কালো, কুৎসিত, দেখতে ইতর, চিন্তায় রুচিহীন, স্বভাবে শুয়োর— সেই পাকিস্তানের লেজুড় বৃত্তি করছেন? যতই লাফালাফি করেন, মোল্লারা আপনাকে বাঁচাতে পারবে না, ওরা

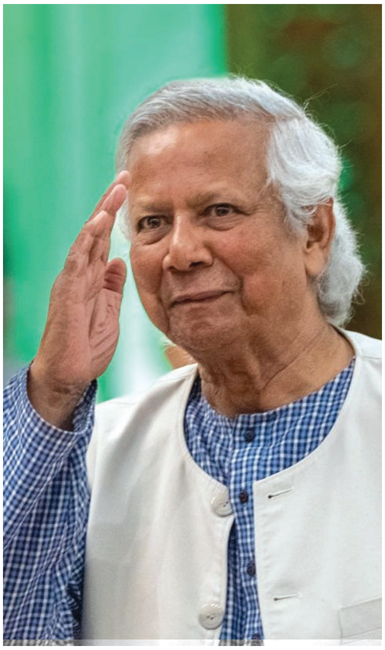

বাহাত্তরের মতো আবার গর্তে ঢুকবে। মালয়েশিয়া ৩৬ জন বাংলাদেশিকে জঙ্গি-সম্পৃক্ততার কারণে আটক করেছে, এদের কাউকে কাউকে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, 'মালয়েশিয়ায় আটক বাংলাদেশিরা জঙ্গি নয়। এটিও ইউনুস ম্যাজিক, মালয়েশিয়া থেকে ঢাকায় আসতে আসতে জঙ্গিরা সব সুবোধ বালক হয়ে গেল। কী চমৎকার, তাই না?

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের সংকল্পপত্রের বিষয়সূচি নির্ধারণ জরুরি

সামনের বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনে জয়লাভের লক্ষ্যে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তির প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পরিস্থিতি ভয়াবহ। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি শোচনীয়। রাজ্যে নারী সুরক্ষা প্রশ্নচিহ্নের মুখে। অর্থনীতি ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় কর্মসংস্থান প্রায় নেই। ফলে যুবসমাজের মধ্যে বেকারত্বের জ্বালা তীব্র। প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক আকার ধারণ করেছে। ভেঙে পড়েছে রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। জেহাদিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা। এহেন কঠিন পরিস্থিতিতে ২০২৬-এর নির্বাচন হলো একটি কঠিন লড়াই। এই নির্বাচন হয়তো নির্ধারণ করতে চলেছে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের বুকে বাঙ্গালি হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব থাকবে কিনা, বাঙ্গালির সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষা পাবে কিনা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ শ্রী শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কাঁধে যথারীতি অর্পিত হয়েছে গুরুদায়িত্ব। তাঁর নেতৃত্বে রাজনৈতিক দলটি সততার সঙ্গে একটি সাহসী ও সুসংগঠিত রূপরেখা স্থাপন করবে এই আস্থা ও বিশ্বাস থেকেই আজ এই চিঠির অবতারণা। পশ্চিমবঙ্গের একজন বাসিন্দা ও ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি। এছাড়াও দলীয় নেতৃত্বের আচার-আচরণ এবং দলীয় কাজকর্ম, সংগঠন পরিচালনার বিষয়েও কয়েকটি কথা এখানে উপস্থাপন করছি। এগুলি ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তির সংকল্পপত্রে অন্তর্ভুক্ত হলে আশা করি দল সমৃদ্ধ হবে। সংকল্পপত্র প্রকাশের পর রাষ্ট্রবাদী শক্তি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয়ে প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়ন করলে পশ্চিমবঙ্গেরও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ ও রাজ্য নেতৃত্বের উচিত কোনোভাবেই স্তাবকদের দ্বারা পরিবৃত না হওয়া। রাস্তায় নেমে রাজ্যের বর্তমান শাসক দলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে তীব্র জন-আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজকে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া জরুরি। রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির পক্ষ থেকে প্রচারিত 'সেটিং তত্ত্ব'কে খণ্ডন করা বিশেষ প্রয়োজন। দল রাজ্যে ক্ষমতাসীন হলে রাতারাতি বড়োলোক হওয়া লোকদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি প্রশাসনিক আতশকাচের নীচে আসা প্রয়োজন। তাদের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সমস্ত অর্থ ও সম্পত্তি ক্রোক করে রাজ্যের কোষাগারে জমা করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে যাঁরা সঠিক তথ্য ও সুলুকসন্ধান দেবেন তাঁদের নাম ও পরিচয়ের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের জন্য সনাতনী হিন্দু রীতিনীতি, আচার-বিচার ও পরম্পরাগত জ্ঞান ও বোধের অনুশীলন যেন দলীয় কর্মী, সমর্থক এবং রাষ্ট্রবাদী জনগণ করে সেই বিষয়ে দল ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগগ্রহণও আবশ্যক। সেক্ষেত্রে তাঁদের জীবনচর্যা সহ-নাগরিকদের কাছে আদর্শ হয়ে উঠতে পারে। ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং সামাজিক আচরণবিধির অবমাননার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ জরুরি।

রাজ্যের প্রতিটি স্কুল ও মাদ্রাসায় জাতীয় সংগীত গাওয়া বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজকে নজর দিতে হবে শারীরিক, মানসিক শক্তি, বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে এবং ইন্দ্রিয় সংযমের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের দিকে। ছাত্রসমাজের নৈতিক-চারিত্রিক উন্নতি সংক্রান্ত বার্তা তাঁদের অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও জরুরি।

সপ্তাহে একদিন করে জেলাভিত্তিক বুথকর্মীদের সঙ্গে রাজ্য নেতৃত্বের সরাসরি আলোচনা হওয়া উচিত। নীচুতলায় শক্তপোক্ত সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুথস্তরে দলীয় অর্থব্যয়বৃদ্ধি প্রয়োজন। মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সামাজিক সংহতির বার্তা দিতে দলীয় পদাধিকারীদের পক্ষ থেকে বিশেষ সভার আয়োজন বাঞ্ছনীয়। দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থানকারী, সহায়-সম্বলহীন প্রবীণ নাগরিকদের পরিচর্যার জন্য তাঁদের আর্থিক সহায়তাদান জরুরি। রাজ্যের সমাজ ও অর্থনীতির সুষম বিকাশের লক্ষ্যে 'বাবা, মা ও দুই সন্তান' ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার উপরেও গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন। 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির' প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষকে সুলভ ও উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা যেতে পারে। রাস্তাঘাট দখল করে কোনো ক্রিয়াকলাপ করতে হলে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আগাম অনুমতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। রাস্তা বা ফুটপাতের দখলদারি নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। সরকারি কাজের টেন্ডার সংক্রান্ত দুর্নীতি, কাটমানি, ঘুষ, স্বজনপোষণ, থ্রেট কালচারের জমানার অবসান ঘটিয়ে অসাধু ব্যক্তিদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিতে হবে। নাশকতামূলক কার্যকলাপে জড়িত থাকলে দ্রুত তদন্ত এবং কঠোর শাস্তিবিধান প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র, ধর্মীয় স্থান, বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে প্রশাসনিক নজরদারি বৃদ্ধি প্রয়োজন। সাব-ডিভিশনভিত্তিক দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরি করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ জরুরি। পরিবেশরক্ষার উদ্দেশ্যে শব্দ, বায়ু ও জলদূষণ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা উচিত। জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ভাঁওতাবাজির স্কিমগুলিকে জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের রূপদান বাঞ্ছনীয়।

রাজ্যের অনুর্বর ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে ভারী শিল্প স্থাপন প্রয়োজন। সুলভ, দ্রুততম, নিয়মিত এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জনপরিবহণে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অর্থবরাদ্দ করা উচিত রাষ্ট্রবাদী শক্তির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের। এই শক্তির নেতৃত্বেই পশ্চিমবঙ্গের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাবে এই আশা রাখি।

—ডাঃ প্রশান্ত কর্মকার,
বিজয়গড়, কলকাতা—৭০০০৩২।

ফ ঃ ৩

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজের প্রতিকৃতি অনন্য ও অসাধারণ

স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক হিসেবে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত, এই পত্রিকার পরপর কয়েকটি সংখ্যার প্রচ্ছদ খুবই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে গত ৪ আগস্ট সংখ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের ছবি-সহ গৌড়ীয় মঠের ছবি খুবই প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী। সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ তথা ভূ-ভারতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে ভক্তি আন্দোলন শুরু করেছিলেন, আজ তা দেশের বাইরেও বিশ্বসভাকে আন্দোলিত করছে। গত ৫০ বছরে বঙ্গসমাজের মানুষের মধ্যে রাজনীতি ও মেকি ধর্মনিরপেক্ষতার আবহে বর্তমান সমাজের নবীন ছাত্র-যুবদের মধ্যে ভক্তিভাবের স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে। সেই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজের ছবি এই প্রজন্মের ছাত্র-যুবদের আকর্ষণ করবে আশা করি। বর্তমান বছরে শ্রীল প্রভুপাদের জন্মের ১৫০তম বর্ষ সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে। গৌড়ীয় মঠ ও অন্যান্য সমকালীন বৈষ্ণব মঠগুলিও সাড়ম্বরে তাঁর সার্ধশতবর্ষ উদ্যাপন করছে। শুধুমাত্র বৈষ্ণব মঠ কেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই ভক্তিরসে আপ্লুত। আমরা যারা স্বস্তিকার নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক তারাও অনেকে শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজের বিষয়ে সম্যক জ্ঞান হয়তো জ্ঞান রাখি না। বর্তমান ছাত্রসমাজের এই সুযোগ আরও কম। স্কুল-কলেজের পাঠ্যবইতে এসবের উল্লেখই থাকে না। শ্রীল প্রভুপাদের বিষয়ে দু'টি লেখাও প্রকাশিত হয়েছে এই সংখ্যায়, যা কিনা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সমৃদ্ধ করবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের বাণী স্মরণ প্রয়োজন। তাঁর মূলকথা— 'আমরা দরিদ্র জীব, ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই হলো মহাধন। প্রেমধন বিনা দরিদ্রজীবন ব্যর্থ।' যতই আমরা আধুনিক বা রাজনীতিমনস্ক হই না কেন, এই ধনকে অস্বীকার করা যায় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও— টাকা মাটি, মাটি টাকা। জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ তাঁর ৬২ বছরের জীবনে ৬৪টি মঠ স্থাপন করেছেন যা জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানদানে জীবের মঙ্গল সাধন করবে। প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ তাঁর অসীম গুণে গুণী হয়ে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন নামে তাঁর প্রারব্ধকাজের পতাকা বহন করে চলেছেন। কেউ গৌড়ীয় মঠ, কেউ চৈতন্য মঠ, গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ, ইসকন ইত্যাদি নামে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনের ধ্বজা বহন করে চলেছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশে গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে তিন বছর ব্যাপী যে উচ্চমার্গের উৎসব পালিত হচ্ছে, যা শুরু হয়েছে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ মহাশয়ের হাত দিয়ে। গত ১৩-১৪ আগস্ট ওড়িশার কটকে বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত। আমরা যারা নিত্য মঠ-মন্দিরে যাই না, তাদের কাছে এই পত্রিকাটি যথেষ্ট বার্তাবহ হবে বলে আশা করি। এছাড়াও আশা করব এইরকম সময়োপযোগী বিষয় স্বস্তিকার পাতায় মাঝে মাঝে আলোচিত হবে যা পাঠকদের সমৃদ্ধ করবে।

—নয়ন বেরা,
মাদপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তত্ত্ব যে কংগ্রেসের তৈরি তা প্রমাণিত হলো

মালেগাঁও বিস্ফোরণের ঘটনায় নিম্ন আদালত দ্বারা সমস্ত অভিযুক্তদের বেকসুর খালাসের ঘটনায় বহু পুরনো বাংলা ছবির একটি বিখ্যাত উক্তি মনে পড়ে যাবে সবার। ছবির নাম— 'সবার উপরে'। উক্তিটি ছিল অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের। মিথ্যা মামলায় বারো বছর জেল খাটার পর আদালত যখন তাঁকে বেকসুর খালাসের রায় দিল, তখন ছবি বিশ্বাস আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন— 'দাও ফিরিয়ে আমার হারিয়ে যাওয়া বারোটা বছর'। মালেগাঁওয়ের মিথ্যা মামলায় বেকসুর খালাস পাওয়া সব অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে বিষয়টা পুরোপুরি একই রকম। অভিযুক্তদের সবাই ছিলেন সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। ঘটনাটি ২০০৮ সালের এবং দীর্ঘ নয়টি বছর অভিযুক্ত আসামি হিসেবে তাঁদের জেলবন্দি থাকতে হয়েছে। দীর্ঘ নয় বছর তো কারান্তরালে তাঁদের জীবনের অমূল্য সময় কেটেছে এবং নষ্ট হয়েছে মান-সম্মান। কালের নিরিখে এই দুটি-ই মানুষের জীবনে অমূল্য, যা কোনো মূল্যে ফিরে আসে না। কে এর জন্য দায়ী?

আদালতের রায়দানের পরেই সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা গর্ব করে বলেছেন যে, হিন্দু সন্ত্রাসবাদ বা গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ বলে কিছু হয় না। ভারত হলো হিন্দুরাষ্ট্র, হিন্দুসমাজের নিজস্ব দেশ, এখানে হিন্দুরা কেন ও কীভাবে সন্ত্রাসী হতে পারে? এই বিষয়টি কংগ্রেস দলের আমদানিকৃত এবং 'স্যাফ্রন টেররিজম' কথাটি চিদাম্বরম, সুশীল শিন্দে, দিগ্বিজয় সিংহের মতো কংগ্রেসি নেতাদের মস্তিষ্কপ্রসূত। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের যাবতীয় ঘটনা তথা দেশভাগের মূল্য এখনও দিতে হচ্ছে দেশবাসীদের। 'গেরুয়া সন্ত্রাসবাদ' নিয়ে নতুন তত্ত্ব খাড়া করে নিরপরাধ মানুষদের বিচারের নামে যেভাবে জেল খাটানো হলো, তাতে কেন দায়ী হবেন না সোনিয়া গান্ধী থেকে শুরু করে চিদাম্বরমের মতো নেতা-নেত্রীরা। তাদের নির্দেশে ও প্ররোচনায় বিনা অপরাধে এই মানুষগুলোর জীবন বিপর্যস্ত হয়। সেই সব কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ আধিকারিক যারা এই মামলার তদন্ত করেছেন, তাদেরই-বা কেন শাস্তি হবে না? আদালতের নির্দেশে আজ যাঁরা নিঃশর্ত মুক্তি পেলেন তাঁদের উচিত হবে এইসব রাষ্ট্রবিরোধী, ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা। এইসব কংগ্রেসি নেতা, যারা 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর মতো শব্দবন্ধ তৈরি করেছেন এবং সেই সব তদন্তকারী যারা এই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে না।

—তারক সাহা,
হিন্দমোটর, হুগলী।

কর্মরত মহিলারা এখনো সমস্যায়

মৌ চৌধুরী

আমাদের দেশে তো বটেই বিশ্ব জুড়ে কর্মরত মহিলাদের জীবনে নানা সমস্যা। সময় ও পরিবারের প্রয়োজনে সংসারের বাইরে পা বাড়াতে হচ্ছে আজ মহিলাদের, কিন্তু ঘরে-বাইরে সমানে পরিশ্রম করেও তারা খুব একটা ভালো থাকতে পারছেন না। এটা ঠিক সময় বদলেছে। এটাও সত্য যে পরিস্থিতি আগের মতো অতটা 'মন্দ' নেই। তবু কিছু কিছু সমস্যা যেন ছাড়তেই চাইছে না। তার জেরে বহু কর্মরত মহিলার জীবনে নেমে আসছে নানা মানসিক ও সামাজিক জটিলতা। বিশ্বে এতদিন কর্মীগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশটাই ছিলেন পুরুষ। কলকারখানায় নানাবিধ পরিশ্রম সাপেক্ষ পেশায় পুরুষের প্রাধান্যই ছিল বেশি। দিন বললের সঙ্গে সঙ্গে নারী প্রায় প্রতিটি পেশায় পুরুষের সামনে পা রেখে চলেছে। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে আমেরিকায় কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের প্রাধান্য সব থেকে বেশি। ইউরোপেও একই চিত্র। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও প্রায় একই রকম ছবি। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে এত কিছুর পরেও কর্মরতা মহিলাদের সমস্যা অনেকটাই রয়ে গেছে। ভারতেও মেয়েরা আজ প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমানে পুরুষদের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। এ কথা কেবল নগরকেন্দ্রিক জীবনের ক্ষেত্রেই সত্য। এর বাইরে কিছু কথা থেকে যায়, সংসারে সমান দায় দায়িত্ব কাঁধে নিয়েও সমাজের কাছে যোগ্য মর্যাদা পাচ্ছেন না নারীরা।

এক সমীক্ষায় অনুযায়ী দেখা গিয়েছে, কর্মরতা মহিলাদের পারিবারিক সমস্যা যেমন রয়েছে, আবার কর্মস্থলের পরিবেশ, পরিস্থিতি, পেশাগত কারণেও কিছু সমস্যা রয়েছে। কিছু সহকর্মীর ব্যবহার অনেক সময় বিরক্তকর হয়ে ওঠে। একঘেয়ে পরিস্থিতির শিকার কোনো মানুষই হতে চায় না। চিকিৎসকরা মনে করেন মনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মানুষ যখন হেরে যায় তখনই অবসাদ আর ক্লান্তি মনকে ভারাক্রান্ত করে। তার থেকে মুক্তি পেতে অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন অনেকেই।

ঘরের-বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরতা মহিলারাই নয়, উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে অতি নিম্নবিত্ত পরিবারের ২৫ থেকে ৫০ বছর বয়সি অনেক মহিলার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে ক্লান্তি ও অবসাদ জনিত অসুস্থতা। অনেক সময়ই দেখা যায় পরিবারের ভেতরেও মহিলা সদস্যরা বিভিন্ন কারণে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন। বিবাহিতা মহিলাদের অনেকেই নিয়মিত এই হেনস্থার মুখে পড়ছেন।

শরীর ও মনকে সতেজ ও ব্যাধিমুক্ত রাখতে দরকার আন্তরিক সাহচর্য। আজকে সমাজ বা পরিবার থেকে সবসময় মহিলারা তা পান না। ফলে তারা সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে ক্রমে অবসাদের শিকার হয়ে পড়েন। নানা সমস্যায় জর্জরিত পারিবারিক জীবন সেখানে চায় সহানুভূতি। মানিয়ে নেওয়ার মতো উদারতার না কারণে থাকায় সমস্যা কেবল বাড়তেই থাকে। মানুষের মনের অস্থিরতা পুরো চিত্রটাকেই কদর্য করে তোলে অনেক সময়। একটা পরিবারের কথা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জয়া ও কল্যাণের সংসার। দুজনেই চাকরি করেন স্বামী স্ত্রীর জীবনে কিছু অশান্তি প্রবেশ ঘটলো প্রায় অকারণে। বিদেশে স্বামী স্ত্রী সংসারের কাজ ভাগ করে নেয়। কিন্তু এদেশে ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ কেবল স্ত্রীর জন্যই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। এইসব কাজ যেন পুরুষদের করতে নেই।

একবার কেউ ভেবে দেখতে চায় না যে, মেয়েরা স্বচ্ছন্দে পুরুষের কাজগুলো নিয়েছে, তাহলে পুরুষেরাই-বা কেন গৃহকর্মের কাজ করবে না? জয়ার সাংসারিক কাজের বহর বাড়তে থাকায় একদিন কল্যাণ তাতে হাত লাগালো। এই সহযোগিতার কারণে কল্যাণের পরিচয় দাঁড়িয়ে গেল স্ত্রৈণ। শ্বশুরবাড়িতে নানা বাক্যবাণে জর্জরিত হতে থাকলো জয়া। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে স্বনির্ভর জয়া একদিন কল্যাণকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য তাতে সমস্যা কমলো না, বেড়েই গেল। চার বছরের শিশুপুত্রকে বাড়িতে রেখে অফিসে যাওয়ার সমস্যা। সারাক্ষণ ছেলেকে দেখার জন্য গৃহকর্মী চাই। তা পাওয়া যায় না, ফলে চার বছর বয়সি ছেলের অসুবিধে হচ্ছে। সমস্যার কীভাবে সমাধান ভেবেই পায় না ওরা। কিন্তু তাতে সমস্যা মেটে না। পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কল্যাণ। ফলে অসহায় হতে থাকে জয়া। যেন সব সমস্যার সমাধানের ভার কেবলই মেয়েদের। সংসার, অফিস, পারিবারিক অশান্তি সব মিলিয়ে জয়া হয়ে ওঠে আর টেনশনের রোগী। তাতে নানা উপসর্গ দেখা দিতে থাকায় সুখগুলো ধীরে ধীরে পরিণত হতে থাকে অসুখে। আজকের এই গতিময় যুগে মানুষ নিজেদের সৃষ্টি করা সমস্যায় নিজেরাই ঘুরপাক খাচ্ছে। পরিবারের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় সমাজ সংসারের পক্ষে ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে পরিবারের মূল স্তম্ভ নারী যার সুপরিচালনায় সোনার সংসার তৈরি হয়, সেই নারীর মানসিকতায় ভারসাম্য থাকছে না। ভারতীয় আদর্শ পারিবারিক সুস্থিতির উপর আঘাত পড়ছে। দ্রুত এর সামগ্রিক পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে সমাজ অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাবে। তার ফলে নারীরা বাইরের কর্মজগতে পিছিয়ে পড়বে। সমস্যায় থাকবে, এটা মোটেই সুখকর নয়। খুবই সত্য হলো, এখনো সমাজের মানসিকতা মধ্য যুগীয় রয়ে গেছে। সমাজ তাদের এই মানসিকতার পরিবর্তন না করলে নারী মনের স্বচ্ছন্দ ফিরবে না যেমন সত্য, পাশাপাশি সত্য হলো নারীকেও কল্পনার বিভ্রম অথবা শৃঙ্খলিত জীব হিসেবে না দেখে বাস্তবের মানুষ হিসেবে দেখলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। □

লিভার নষ্টের জন্য দায়ী যে ৯টি খারাপ অভ্যাস

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

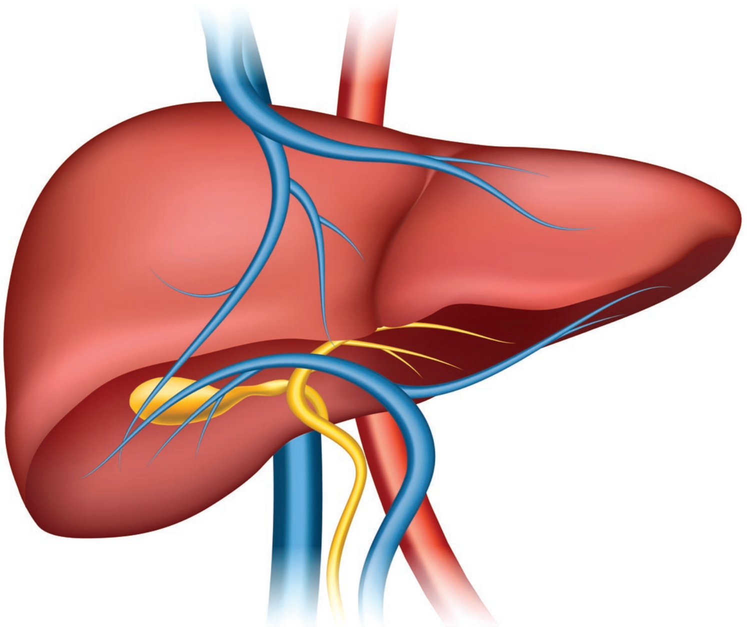

আমাদের দেহের প্রধান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে লিভার অন্যতম। দেহের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় লিভারের সুস্থতা অনেক জরুরি। সে হিসেবে আমাদের দেহে সুস্থতা নির্ভর করে লিভারের ওপরেই। কিন্তু আমাদের কিছু বাজে অভ্যাসের কারণে প্রতিনিয়ত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে লিভার। এরই ফলাফল হিসেবে লিভার ড্যামেজের মতো মারাত্মক সমস্যায় ভুগতে দেখা যায় অনেককেই। অনেকে জেনে বুঝে, আবার অনেকে না জেনে কিছু বাজে কাজের মাধ্যমে দেহের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই অঙ্গটি নষ্ট করে ফেলছেন ধীরে ধীরে।

১. অনেক দেরি করে ঘুমতে যাওয়া এবং অনেক দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা দুটোই লিভার নষ্টের মূল কারণ হিসেবে ধরা হয়। কারণ এতে শারীরিক চক্রে সম্পূর্ণ উলটোটা ঘটতে থাকে যার মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়ে লিভারের ওপর।

২. অনেকেই সকালে ঘুম থেকে ওঠার আলসেমিতে প্রস্রাবে বেগ হলেও বাথরুমে যায় না, চেপে শুয়েই থাকেন। এতে লিভারের ওপরে চাপ পড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে লিভার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারায়।

৩. অতিরিক্ত বেশি খাওয়াদাওয়া করা লিভারের জন্য ক্ষতিকর একটি অভ্যাস। অনেকেই রয়েছে অনেকটা সময় না খেয়ে একেবারে অনেক বেশি খেয়ে ফেলেন। এতে করে হুট করে লিভারের ওপরে চাপ বেশি পড়ে যায়, যার ফলে লিভার নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪. সকালের খাবার না খাওয়া লিভার নষ্টের আরেকটি মূল কারণ। অনেকটা সময় পেট খালি থাকার কারণে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পাশাপাশি খাদ্যের অভাবে কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে লিভারও।

৫. অনেক বেশি ওষুধ সেবন করা। বিশেষ করে ব্যথানাশক ওষুধ অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়ার প্রভাব পড়তে থাকে লিভারের কর্মক্ষমতার উপরে। এছাড়া ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেও ক্ষতি হয় লিভারের। এতে করে লিভার নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

৬. কেমিক্যাল যুক্ত যেকোনো কিছুই লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিন্তু আলসেমি ও মুখের স্বাদের জন্য আমরা অনেকেই প্রিজারভেটিভ খাবার, অ্যার্টিফিশিয়াল ফুড কালার, অ্যার্টিফিশিয়াল চিনি ইত্যাদি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলি যা লিভার নষ্টের অন্যতম কারণ।

৭. খাবার তেল ও অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। একই তেলে বার বার ভাজা খাবার বা পোড়া তেলের খাবার বেশি পরিমাণে খাওয়া হলে লিভার তার স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে।

৮. অতিরিক্ত কাঁচা খাবার খাওয়াও লিভারের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যেমন আপনি যদি খুব বেশি কাঁচা ফল-মূল বা সবজি খেতে থাকেন তাহলে তা হজমের জন্য অতিরিক্ত কাজ করতে হয় পরিপাকতন্ত্রের। এর প্রভাব পড়ে লিভারের ওপরেও। সুতরাং অতিরিক্ত পরিমাণে খাবার খাবেন না।

৯. অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্য পান করা লিভার নষ্টের আরেকটি মূল কারণ। অ্যালকোহলের ক্ষতিকর উপাদান সমূহ লিভারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ। □

অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত ও বিতাড়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে এনআরসি-র প্রয়োজন

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর সহকর্মী ফিরহাদ হাকিম অনবরত হুমকি দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গে সিএএ এবং এনআরসি করতে দেবেন না, নাগরিকত্ব কাড়া হলে জীবন দিয়ে রুখবেন। এখানে যারা বাস করছেন তারা সকলেই এদেশের নাগরিক। তৃণমূল সরকার এবং সেকুলার পন্থীদের অবগতির জন্য কিছু তথ্য তুলে ধরছি :

(১) ১১.৪.২০২০ ফাঁসি হয়ে গেল মুজিব খুনি আবদুল মাজেদের। সে ২৩ বছর কলকাতায় আত্মগোপন করে ছিল— যুগশঙ্খ ১২.৪.২০।

(২) পশ্চিমবঙ্গে ৪০ বছর ধরে পাকাপাকি ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল মুজিব হত্যার চাঁই রিসেলদার মোসলেউদ্দিন। সে গোবরডাঙ্গার চাঁদপাড়া এলাকায় দত্ত ডাক্তার নাম ধারণ করে একটি আয়ুর্বেদ ফার্মেসি চালাত, যুগশঙ্খ ৭.১১.২১, (পরে তাকে গ্রেপ্তার করে শেখ হাসিনা ফাঁসি কাঠে চড়ায়)।

(৩) অনুপ্রবেশ রাজনীতি--- দৈনিক স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয় ২৯.৩.২০০৭ টা পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি মুখ্যমন্ত্রী এবং ফিরহাদ হাকিম সাহেবকে।

(৪) ১২ লক্ষ বাংলাদেশি দেশে ফেরেনি বলছে বিএসএফ, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮.১.২০০৬।

(৫) যেসব বাংলাদেশি ঢুকেছে তাদের ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেছি— জ্যোতি বসু। বর্তমান ২.৪.১৯৯৩।

(৬) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর রিপোর্ট— রাজ্যে ৭০ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী : ব্যাপক হারে জাল সার্টিফিকেট নিয়ে এদেশে এসে মিশে যাচ্ছে বাংলাদেশিরা, বর্তমান ২০.৪.২০০৪।

(৭) অনুপ্রবেশকারী নিয়ে মন্তব্য, মোদীর গ্রেপ্তার চান মমতা। আনন্দবাজার পত্রিকা ৫.৫.২০১৪।

(৮) অনুপ্রবেশকারীদের দখলে চলে যাচ্ছে কলকাতা—মায়ের ডাক ১০.২.২০০৬।

(৯) সম্পাদক সমীপেষু আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩.৩.১৯৯৬, অনুপ্রবেশ নিয়ে ৫ জন বিদগ্ধ বাঙ্গালির পত্র যার মধ্যে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ থেকে জনৈক ডক্টরেটের পত্রও আছে, অবশ্যই পাঠ্য।

(১০) ৩০ লক্ষ বাংলাদেশি পশ্চিমবঙ্গে। আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১.৭.১৯৯০।

(১১) কত বেআইনি বালাদেশি ? পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের কাছে তথ্য চাইবে কেন্দ্র ২০১১-র জনগণনা প্রক্রিয়া শুরু— বর্তমান ৬.১০.২০০৯।

(১২) অনুপ্রবেশ-২ 'সম্পাদক সমীপেষু' আ: বা: প: ১৪.৩.১৯৯৬

(১৩) সবিনয় নিবেদন— দি স্টেটস ম্যান ৮.১০.২০০৮।

(৬) ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার বাংলাদেশির হদিশ নেই

যেসব বাংলাদেশি ঢুকেছে তাদের ফেরত পাঠাতে নিষেধ করেছি : জ্যোতি বসু

স্টাফ রিপোর্টার। 'গত ৩০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৬ লাখ ৭৫ হাজার মানুষ বৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে। কিন্তু তাদের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁরা কোথায় গেলেন, বাংলাদেশে ফিরলেন, না, ভারতেই থেকে গেলেন তারও কোনও হিসেব নেই। এছাড়াও অনেক মানুষ ভারতে ঢুকছেন। এটা বন্ধ করতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বৃহস্পতিবার বিধানসভায় এই মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, খবর আছে, সীমান্ত এলাকায় ওপার থেকে বহু মানুষ কাজ করতে এপারে আসেন। কাজ করে আবার ফিরে যান।

(১৪) বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের ছক? বর্তমান ২২.১০.২০১৪।

(১৫) অনুপ্রবেশ— সীমান্তরক্ষী বাহিনীর চোখ এড়িয়ে রোজ হাজার হাজার লোক ঢুকছে বাংলাদেশ থেকে। পশ্চিমবঙ্গে মিশে যাচ্ছে এপার পশ্চিমবঙ্গের জনারণ্যে। সেই সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে চলছে অবাধ চোরা কারবার, ফটো-সহ এক পৃষ্ঠাব্যাপী আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৭.৩.১৯৯১ লিখেছেন তাপস সিংহ।

(১৬) বেপরোয়া মোহাজির--- রাজ্য প্রশাসনের হেডকোয়ার্টার্স রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করছে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের একটি সংগঠন। আর সেই খবরটি সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পাননি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত। সাংবাদিক বৈঠকটি ডেকেছে অনুপ্রবেশকারীদের সংগঠন 'বাংলাদেশ মোহাজির সঙ্ঘ'। সাংবাদিকরা অবাক হয়ে দেখেছেন উদ্যোক্তারা তাদের সমর্থনে এক বিরাট মিছিল এনে হাজির করেছে। সঙ্ঘের সভাপতি রইসউদ্দিন বিশ্বাস দাবি তুলেছে তারা চায় ভারতের নাগরিকত্ব এবং খেয়ে পরে বাঁচতে। সঙ্ঘের উদ্যোক্তরা পরিষ্কার ভাষায় স্বীকার করেছেন কলকাতা ও সংলগ্ন অঞ্চলে এক লক্ষ বাংলাদেশি ঝুপড়ী করে বাস করছেন কেউ-বা আছে ফুটপাতে। সঙ্ঘের নিজস্ব হিসেব অনুযায়ী সারা ভারতে এই অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা পাঁচ লক্ষ। আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭.৩.১৯৯১।

(১৭) দিল্লির জনৈক আইনজীবী কেতন দত্ত কর্তৃক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এদেশ থেকে বিতাড়নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা দায়ের করার পর দিল্লি হাইকোর্ট বার বার ভর্ৎসনা করার পরও দিল্লির কংগ্রেস সরকার এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার নানা অজুহাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের কোনো ব্যবস্থাই করেননি। বরং তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বলেন মানবিকতার কারণে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো সম্ভব নয়, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭.৫.২০০৫।

(১৮) ভারত সরকারের এক গোপন রিপোর্টে প্রকাশ দিল্লির ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি লোকসভা কেন্দ্র এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ভর করে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের দ্বারা। সম্পাদকীয় বর্তমান ১০.৮.২০০৮।

(১৯) আমাদের পাড়ায় জনৈক ছাতা মেরামতকারী আসেন, বাড়ি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় ওখানেও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আছে। উত্তর ২৪ পরগনায় তালাক প্রাপ্তা এক মুসলমান মহিলাকে সাদি করে নিয়েছেন এখানেও পুত্র কন্যা আছে। সে আমাকে বলেছে এখানেও তার ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড আছে। বাংলাদেশ যাওয়ার সময় কোনো পাসপোর্ট ভিসার প্রয়োজন হয় না।

(২০) সবচেয়ে মারাত্মক যে ঘটনা সেটা হলো ১৯৭১-এর বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যে রাজাকাররা বাংলাদেশে ৩০ লক্ষ লোককে নৃশংসভাবে খুন করেছিল এবং ৪ লক্ষ মহিলাকে দিনের পর দিন আটক রেখে ধর্ষণ করেছিল তারা সব এখন ইসলামপুর, পূর্ণিয়া করিডোর দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের বদান্যতায় এদের জন্য বিশাল বিশাল শেড তৈরি হয় এবং বাংলাদেশ সরকার এদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা করে। কথা ছিল এদেরকে পাকিস্তান সরকার সেদেশে নিয়ে যাবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার একজন রাজাকারকেও ফেরত নেয়নি। এরা সব ভারতে ঢুকে পড়েছে এবং স্থানীয় মুসলমান এবং ভোটলোভী রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি করে ভারতের নাগরিক হয়ে গেছে। এদের হাতেই এখন আমাদের সরকার গড়ার চাবি কাঠি।

(২১) মুখ্যমন্ত্রী উবাচ--- সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের বলছি আমরা আপনাদের ভোটের কথা ভেবেই বিজেপিকে ছেড়েছি। এবার আমাদের দেখুন। দেশ ২.৩.২০০৮।

(২২) মোদীজীর বক্তব্যের পরেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা প্রশ্ন তুলেছেন, 'যারা ঘৃণা ছড়াচ্ছেন হিংসায় উসকানি দিচ্ছেন, তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হবে না? পশ্চিমবঙ্গের একটা মানুষের গায়ে হাত তুলতে দেব না। নির্বাচন কমিশনকে বলব, তাকে গ্রেপ্তার করুন কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাক। তৃণমূল নেত্রীর চ্যালেঞ্জ আমি এখনও বলছি একটা লোকের গায়ে হাত দিয়ে দেখ, কে শরণার্থী, কে অনুপ্রবেশকারী তা তুমি বলার কে? এরা সবাই নাগরিক, বাংলাদেশের যুদ্ধের আগে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে এসে একথা কেউ বলতে পারেন না। আনন্দবাজার পত্রিকা ৫.৫.২০১৪।

নিবিড় সংশোধনে মমতা ব্যানার্জির এত আড়ষ্টতা, পাঁকে পড়ার দশা কেন?

মমতা ব্যানার্জি যে ন্যারেটিভ তৈরি করছেন তা শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক চাল নয়। তা হিন্দু, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রকৃত বাঙ্গালি এবং বৃহত্তর আঙ্গিকে অতি অবশ্যই ভারতের সুরক্ষার সঙ্গে তঞ্চকতা।

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

—মাসিমা মালপো খামু।

—ফুফা গোস্ত করছ আজ?

প্রথমটা বাংলাভাষা (পূর্ববঙ্গীয় ডায়ালেক্ট বা উপভাষা)। দ্বিতীয়টা বাংলাদেশি ভাষা যা আরব সাম্রাজ্যবাদ-জারিত খাঁটি মোল্লাবাদের ফসল।

একই ভাষার ভিন্ন কথনশৈলী ও শব্দচয়নে বাঙ্গালি আর বাংলাদেশি মোল্লাবাদীরা (কমিউনিস্টদের দাবি অনুযায়ী তারাও নাকি 'বাঙ্গালি') একে অপরের থেকে অনেক অনেক ক্রোশ দূরের। সেই দূরত্ব যতক্ষণ না নিবিড় নিবিষ্টতায় দেখা বা পর্যালোচনা করা হবে ততক্ষণ অনুপ্রবেশ এই গতিতেই চলবে।

'পোয়েটিক জাস্টিস' বলে ইংরেজিতে একটি ইডিয়মের প্রচলন রয়েছে। এই বাগ্‌ধারা বা শব্দবন্ধের অর্থ হলো 'উপযুক্ত পুরস্কার' বা 'উপযুক্ত শাস্তি'। সেই পোয়েটিক জাস্টিস-টা এবার তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে অনুভব করতেই হবে। ভোটে তার ফলাফল কতদূর, কী হবে তা যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ। এই বছরের মার্চ মাসেই পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটারদের উপস্থিতির একাধিক উদাহরণ তুলে ধরে স্তূপীকৃত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলনেত্রী দাবি করেন, 'নির্বাচন কমিশন ঘুমোচ্ছে, আর সেই সুযোগে নীচের তলায় ভোটার তালিকা তৈরিতে অনিয়মের বন্যা বইছে। বারবার বলা হলেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।' তার অভিযোগ ছিল যে, ভিন রাজ্যের এপিক নম্বর এবং পশ্চিমবঙ্গের এপিক নম্বর ম্যাচ করছে। তার দল দাবি করে ভূতুড়ে ভোটারদের রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিক কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন। মার্চ মাসেই তৃণমূল জানায় যে, ভোটার তালিকা তৈরি তাদের কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস সক্রিয় হওয়ার কারণে সেই যাত্রায় ৭,৮০০ ভূতুড়ে ভোটারের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়, যদিও কাজটি করেছিল নির্বাচন কমিশন। অতএব মমতা ব্যানার্জিই মাস ছয় আগে প্রমাণ করলেন যে ভূতুড়ে ভোটার হয়। খুব ভালো অভিযোগ, তার মীমাংসাও হলো। তাহলে আজ যখন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন অসংখ্য অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ভোটার

তালিকা ঝাড়াপোঁছার জন্য বিহারে স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশনের কাজ শুরু করল, তখন কেন প্রমাদ গুনল তৃণমূল কংগ্রেস? ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হতেই বিহারে বাদ গেল লক্ষ লক্ষ মৃত, ভুয়ো ও অবৈধ ভোটার। এছাড়াও অনেকেই ছিলেন যারা দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট কেন্দ্রে ভোট দেন না অথচ ভোটার তালিকায় তাদের নাম থেকে গিয়েছে। ভোটার তালিকায় 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন'-এর কাজ বিহারে শুরু হতেই পাশের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে উদ্দাম রাজনৈতিক নৃত্য শুরু করল তৃণমূল। কারণ বিহারের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। বিহারের মতো এখানেও যদি ভোটার তালিকায় ঝাড়াইবাছাইয়ের কাজ শুরু হয় তাহলে তো কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোনোর সম্ভাবনা! এ রাজ্যে অনুমেয় জালি ভোটারের সংখ্যা তো লক্ষ ছাড়িয়ে কোটিতে। আসলে তা কত লক্ষ বা কত কোটি সেই সম্পর্কে মমতা ব্যানার্জি নিজেই নিশ্চিত নন। সেই সংখ্যাটা এত বড়ো যে, তা হলো তার ভোটব্যাংক নামক সম্পদ। ভোট মেশিনারিরও সম্পদ। পশ্চিমবঙ্গের এই অবৈধ ভোটারদের অধিকাংশ হলো অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমান। সীমান্ত পেরিয়ে তারা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে রাজ্যের শাসক দলের মদতে, অবৈধ উপায়ে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি পরিচয়পত্রগুলি সংগ্রহ করে। তাদের আবার একটা বড়ো অংশ হলো পরিযায়ী শ্রমিক। অর্থনীতির দুর্দশার কারণে এই রাজ্যে কাজের বড়ো অভাব। তাই পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গেড়ে, এখান থেকে পরিচয়পত্র বানিয়ে নিয়ে তারা ভারতের নানা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এই মুহূর্তে তৃণমূলনেত্রীর সবচেয়ে বড়ো অস্বস্তির বিষয় হলো এইসব 'বাংলাভাষী' পরিযায়ী শ্রমিক। এই অনুপ্রবেশকারীরাই এখন দেশজুড়ে যাবতীয় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এরা বাংলায় মা বলুক বা আম্মি, তাদের অনেকেই ভিন রাজ্যে হাতুড়ি-করাত-পাইপ-সিমেন্টের কাজে ব্যস্ত। পেশাগত পরিচয়ের আড়ালে অনেকে বিভিন্ন জেহাদি সংগঠনের স্লিপার সেলের সদস্য এবং ভারতবিরোধী নানা কার্যকলাপে যুক্ত। এই প্রেক্ষিতে উঠে আসতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিভিন্ন রাজ্যে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কত? পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার সেই ছবিটা ভয়ানক ঠেকেছিল কোভিড আবহে লকডাউনে। রাজ্যে যে কাজ নেই, এখানে অর্থনীতির যে বেহাল দশা তা প্রকাশ্যে চলে আসায় ঈশান কোণে কালো মেঘ দেখেছিল তৃণমূল। ২০২৩-এ কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্যের কাছে হলফনামা চেয়ে জানতে চায় যে, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যায় কত দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সাল থেকেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে এই প্রশ্ন করা হচ্ছিল, কিন্তু ২০২৩-এও সে উত্তর দিতে পারেনি রাজ্য সরকার। এমনকী পৃথকভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের চিহ্নিত পর্যন্ত করেনি এই সরকার। লকডাউনকালে যখন দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক এ রাজ্যে ফিরছে, তখন গোটা রাজ্যের চোখ সত্যিই কপালে ওঠার উপক্রম হয়। এটাই হলো বুদ্ধিজীবী-সমাজ সংস্কারক-চিন্তাশীল-শিক্ষিত বাঙ্গালির পশ্চিমবঙ্গ! যাঁরা দেশকে বিচার-বুদ্ধি-শিক্ষা-সংস্কৃতির উদাত্ত আলো দিত, তাঁদের রাজ্য থেকে পরিযায়ী শ্রমিকরা আজ গোটা দেশে যাচ্ছে বা যেতে বাধ্য হচ্ছে। আরও পরিতাপের বিষয় হলো, তাদের অনেকের বাংলাভাষার কথনশৈলী, উচ্চারণের প্রকৃতি থেকে অনেকের মনে নানা সন্দেহ দানা বাঁধছে। প্রশ্ন উঠছে, কেমন বাংলাভাষী এরা? পশ্চিমবঙ্গ থেকে বানানো ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড হাতে থাকলেই যে সে জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বা ভারতের নাগরিক, নাকি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা মুসলমান— এই জিজ্ঞাসা, সন্দেহ আপামর বাঙ্গালির জন্য নিশ্চিতভাবে অস্বস্তির। কিন্তু এই প্রশ্ন বা সন্দেহ না করলে আগামীদিনের ভারতের কপালে 'স্বস্তি' নাও লেখা থাকতে পারে। এইসব মুসলমান পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জি অন্ধ। ২০২২-২৩-এ পশ্চিমবঙ্গে ১৭১টি কারখানা বন্ধ হয়। ২০২৩-২৪-এ বন্ধ হয় ১৬৯টি কারখানা। ২০২৪-এ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক একবার বলেন যে, এ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ২১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৩৭ জন। স্বাভাবিক বুদ্ধি বলে, এটা হয়তো নিবন্ধিত সংখ্যা। বাস্তবে এর অন্তত কয়েক গুণ পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছে যারা রাজ্যের শ্রম দপ্তরে নিবন্ধিত না হওয়ার কারণে 'পরিযায়ী' তালিকাভুক্ত নয়। এই ক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ যদিও আবশ্যক নয়। এছাড়াও, এরকম নিবন্ধীকরণের নিয়ম যে রয়েছে তাই-ই জানে না অধিকাংশ পরিযায়ী শ্রমিক। আরও একটি ইচ্ছাকৃত ফাঁকিবাজির কারণেও অসংখ্য 'বাংলাভাষী' পরিযায়ীরা নিবন্ধিত নয়। এই সমস্ত বাংলাভাষীরা তো ভারতীয় ছদ্মবেশধারী, তথাকথিত বাঙ্গালি, পরিযায়ী শ্রমিক। কাঁটাতার না থাকায় পূর্বসীমান্তের একটা বড়ো অংশ অরক্ষিত। রাজ্যের শাসক দলের মদতে চলে অবাধ অনুপ্রবেশ। এই অনুপ্রবেশকারীদের অনেকের হাতেই রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন ঠিকানার ভুয়ো ভোটার কার্ড। রাজ্যের শাসকদল এবং স্থানীয় প্রশাসনের ঢালাও মদতে তৈরি হয়েছে এইসব পরিচয়পত্র। এই বাংলাভাষী অনুপ্রবেশকারীরা আদতে ভারতবিরোধী। তৃণমূলের ভোট মেশিনারি। ভোটের সময় তাদের এ রাজ্যে জামাই আদরে নিয়ে আসে তৃণমূল। এরাই ভুয়ো ভোটার, সমাজবিরোধী এবং বুথ লুটেরা।

শাসকদল এবং স্থানীয় প্রশাসনের ঢালাও মদতে তৈরি হয়েছে এইসব পরিচয়পত্র। এই বাংলাভাষী অনুপ্রবেশকারীরা আদতে ভারতবিরোধী। তৃণমূলের ভোট মেশিনারি।

বাংলাদেশি মুসলমানরা পিসিমাকে বলে খালা, মাসিমাকে ফুফা, বাবাকে আব্বা, নিমন্ত্রণের পরিবর্তে বলে দাওয়াত, ন্যায়বিচারকে বলে ইনসাফ, এছাড়াও এমন অসংখ্য আরবি শব্দ-জারিত ভাষায় তারা কথা বলে। কিন্তু কংগ্রেসি- কমিউনিস্টরা এগুলিকে একযোগে 'বাংলাভাষা' বলেই চালিয়ে দেয়। অনুপ্রবেশকারীরাও 'বাঙ্গালি' পরিচয় দিয়ে পার পেতে চায়। সেই সব ফন্দিফিকির করেই তারা সীমান্ত পার হয়। সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে শাসক দল এবং শাসক দল ঘনিষ্ঠ মধ্যস্থতাকারী দালালচক্রকে তারা টাকা দেয়। তৈরি হয় তাদের ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র। অনেকে পশ্চিমবঙ্গে আস্তানা গাড়লেও বাকিরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা দেশজুড়ে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে তারা ঘরবাড়ি, বস্তি তৈরি করে সেখানেও তাদের ঘিরে

স্থানীয় লোকজনের পক্ষ থেকে অনেক প্রশ্ন উঠে আসাই স্বাভাবিক। কে? কবে এল? কী করে? পরিবারে ক'জন ইত্যাদি। অতএব শাসক দলের দাওয়াই হলো এখানে আস্তানা তৈরি করে তোমরা ভিন রাজ্যে যাও। মোল্লাবাদের শ্রমিক তোমরা। যখন যখন ভারত বিদ্বেষের চক্রান্ত দরকার তখনই কোমর বেঁধে নেমে যাও। আর ভোট এলে অতি অবশ্যই ভোট লুঠেরার কাজ করে যেও পশ্চিমবঙ্গে এসে। এককথায় এরা হলো পরিযায়ী দুধেল গাই। শুনতে তিক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই পশ্চিমবঙ্গের দুধেল গাই পরিযায়ীদের আসল স্বরূপ। মলয় ঘটকের দেওয়া পরিসংখ্যানটাই যদি তর্কের খাতিরে ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও প্রশ্ন— পশ্চিমবঙ্গ কি পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের হাব? শিক্ষা হাব, সংস্কৃতি হাব থেকে এই রাজ্যের আজ এই দশা! পরিস্থিতি কতটা শোচনীয় হলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বলে যে, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড চূড়ান্ত পরিচিতি নয়। এটা পশ্চিমবঙ্গবাসী বাঙ্গালির কাছে যেমন বিরক্তির, তেমনই লজ্জার। সম্প্রতি মিনাখাঁয় দেখা গেল জেরক্স বা ফোটোকপির দোকানের আড়ালে ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরির রমরমা ব্যবসা। জাল আধার কার্ড তৈরির চক্র ধরা পড়ল সন্দেশখালিতে। কাকদ্বীপে ধরা পড়ল একই চক্র। মেখলিগঞ্জেও একই ছবি। কুচলিবাড়ি, হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে দেখা গেল যুব তৃণমূল নেতাই এই চক্রে জড়িত। কাকদ্বীপের রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত তো ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির বড়ো ফ্যাক্টরি। কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া একটি মামলার সূত্রে জানা গিয়েছে যে, গোসাবার পাঠানখালি পঞ্চায়েত থেকে ২০২১ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে চার হাজারেরও বেশি ভুয়ো বার্থ সার্টিফিকেট বা জন্ম শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে।

অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিতকরণের উদ্দেশ্যে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করে উত্তরাখণ্ড সরকার। সেখানে নির্দেশিকা জারি হয় যে, সব পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখতে হবে। অবৈধ কার্ড এবং সন্দেহজনক কাউকে দেখলে সতর্কতা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ একান্ত দরকার। তার বিপ্রতীপে মমতা ব্যানার্জি দাবি করছেন যে, 'বাঙ্গালি' ভিনরাজ্যে আক্রান্ত। ভুয়ো পরিচয়পত্র-সহ অনুপ্রবেশকারীদের ধরা পড়ার ক্ষেত্রে রাজ্যের এই শাসক দলই তো দায়ী। দিনের পর দিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের এরা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে। দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী ঢোকানোর প্রশাসনিক সিংহদ্বার এরাই তৈরি করেছে। একজন অনুপ্রবেশকারী তো মায়ানমার বা বাংলাদেশ থেকে উড়ে উড়ে গুরগাঁও, মুম্বই বা তামিলনাড়ু যায় না। তাকে পশ্চিমবঙ্গ পার করতে হয়, সেখানে থাকতে হয় এবং সেখান থেকে ভুয়ো ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড সংগ্রহ করতে হয়। মমতা ব্যানার্জির দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন এবং দুধেল গাই-প্রিয় ভোট মেশিনারির জন্য আজ ভিনরাজ্যে মুড়িমিছরি একাকার। এটাই বাঙ্গালির লজ্জা! প্রবাসী বাঙ্গালির চেয়ে পরিযায়ী বাংলাভাষী আজ সংখ্যায় বেশি। বাঙ্গালির আত্মসম্মান আরও নানা কারণে গড়াগড়ি খাচ্ছে। বাংলাভাষী, খেটে খাওয়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের কে যে সত্যিই পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র, ভারতীয় নাগরিক আর কে যে বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা তা বোঝাটাই অন্য রাজ্যের লোকজনের কাছে অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই বিভ্রান্তির কারণে কয়েকটি রাজ্যে এমন দশা যে সেখানে ধরে আনতে বললে, পুলিশ অনেক সময়ই বেঁধে আনছে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলেই চলছে বাংলাভাষী পরিযায়ীদের ধরপাকড়। এই ব্যাপারে বলা যায় যে, অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়নের ক্ষেত্রে গাছাড়া মনোভাব দেখানোর পরিবর্তে সাময়িক সন্দেহের বশে ধরা পড়া পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি সেজে থাকা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের

চিফ ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার

ফঃ ৪

প্রশাসনিক জেরা বিশেষভাবে দরকার। ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ তারা দেখাতে না পারলে তাদের গ্রেপ্তারি ও বহিষ্কার ভারতের নিরাপত্তার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এখন বলছেন, ফিরে আসুক সব পরিযায়ী শ্রমিক, আমরা কাজ দেব। প্রশ্ন হলো, তাহলে এরা 'পরিযায়ী' হলো কেন? ভিন রাজ্যে একদিন কাজে, অর্থাৎ রোজের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশি পারিশ্রমিক মেলে। তাই কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে লকডাউন আংশিক শিথিল হতেই দলে দলে মানুষ আবার ভিনরাজ্যেই চলে যায়। মমতা ব্যানার্জি কিন্তু তাদের আটকে রাখতে পারেননি সেদিন। নির্বাচন কমিশনের নিবিড় সংশোধনের জন্য আরও একটা কারণে মমতা ব্যানার্জির মনে শঙ্কা জাগছে। তা হলো ১৯৫০-এর ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৯(বি) ধারায় উল্লেখ রয়েছে 'অর্ডিনারি রেসিডেন্ট' শব্দবন্ধটির। ২০ নং ধারায় এর ব্যাখ্যাও রয়েছে। ধরা যাক একজন থাকতেন মালদায়। তিনি বিগত দশ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে দিল্লিতেই থাকছেন। ওটাই এত বছর ধরে তার রুটিরুজির ঠিকানা। তখন সেই 'অর্ডিনারি রেসিডেন্ট'-এর নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিবর্তিত ঠিকানাতেই ভোটার তালিকায় তার নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দ্রুত নগরায়ণ, জীবন-অভ্যাসের পরিবর্তন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কারণে ঠিকানা পরিবর্তন মানুষের জীবনে স্বাভাবিক নিয়মেই উপস্থিত। নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস না করা পরিযায়ীদের নাম ভোটার তালিকায় থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। কমিশন বলতে পারে যে রাজ্যে এই লোকজন বর্তমানে রয়েছেন, সেখানেই তারা ভোটার তালিকাভুক্ত হোক, বা যাদের একাধিক স্থানে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে, তাদের নাম বাদ যাক। তাহলে তো তৃণমূলের মহা মুশকিল! মমতা ব্যানার্জির ভোটদুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। তখন কারা দেবে জাল ভোট? কারা করবে ভোটে কারচুপি? কারাই বা ভোটের সময় এসে গুন্ডামি করবে? এটাই নিবিড় সংশোধনের ক্ষেত্রে মমতা ব্যানার্জির আপত্তির মূল কারণ। এর ফলাফল হলো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তার সংঘাত।

তৃণমূলের আরও একটা দ্বিচারিতা লক্ষণীয়। বিএসএফ ২০২৪ সালে ২,৪২৫ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছে। ২০২৫-এর মে মাস পর্যন্ত সীমান্তের ওপারে ঠেলেছে ৫৫৭ জন অনুপ্রবেশকারীকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেই ধাওয়া করে ২৭৪ জনকে তারা তাড়িয়েছে বলে সংবাদসূত্রে খবর। এই পরিসংখ্যান সামনে আসার পর মমতা ব্যানার্জির মন্তব্য শুনলে হাস্যকর মনে হবে। তিনি বলেছেন যে, বিএসএফ অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকতে সাহায্য করে। তর্কের খাতিরে মমতা ব্যানার্জির কথা মেনে নিলে নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব তো আরও বেড়ে গেল। কে আসল, কে জাল; কে বাঙ্গালি আর কে বাঙ্গালির মতো, কে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র আর কে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি তা চিহ্নিত করা যে দরকার— সেই ইঙ্গিত তো মমতা ব্যানার্জির কথাতেই পাওয়া গেল। তার কথা অনুযায়ী, বিএসএফ ভীষণ দুষ্টু, কিন্তু নির্বাচন কমিশন তো ভালো! তারা তো রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী ঢোকায় না। বাস্তব হলো এই যে, ভিনরাজ্যের পুলিশ কিন্তু সেখানে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙ্গালিদের ওপর একটা আঁচড়ও দিচ্ছে না। সেই রাজ্যগুলিতে বাঙ্গালি পাড়ায় হিন্দিভাষী মানুষ একজন বাঙ্গালিবাবুকে ডাকে 'দাদা' বলেই। প্রবাসী বাঙ্গালিদের অন্য মর্যাদা রয়েছে ভারত ও বিশ্বজুড়ে। প্রবাসী বাঙ্গালি আর পরিযায়ী বাংলাভাষীর মধ্যে অনেক তফাত। সেই গুণগত মানের তফাতটা হয়েছে বাঙ্গালি সেজে জনারণ্যে মিশে থাকা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য। বাঙ্গালির দুর্ভাগ্য যে, এই মোল্লাবাদীদের আর নদীয়ার বাসিন্দা, কাঠের কাজ করা তুলসীমালা পরা একজন পরিযায়ী শ্রমিককে ভাষাগত বিভ্রান্তির কারণে ভিনরাজ্যের পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই পৃথক করতে পারছে না। ভদ্রলোকের ভাষা বাংলা আজ মোল্লাবাদী, বাংলাদেশিদের জন্য চিহ্নিত হচ্ছে আতঙ্কের ভাষা হিসেবে। সব ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জি রাজনৈতিক তর্ক জুড়ছেন। কিন্তু বাঙ্গালি জাতিসত্তার যে কী ভীষণ দুর্গতি উপস্থিত হচ্ছে সেই ব্যাপারে কিছু বলছেন না। বাংলাভাষী, পরিযায়ী শ্রমিকরা সন্দেহের শিকার— এটা বলার আগে বলতে হবে যে এই পরিযায়ীদের একটা বড়ো অংশ হলো বাংলাদেশি, মোল্লাবাদী এবং তারা আরবি-মিশ্রিত বাংলাটাই জানে। কাঁটাতার দেওয়ার জন্য বিএসএফ-কে জমি না দিয়ে মমতা ব্যানার্জি সীমান্তকে শতছিদ্র রাখবেন এবং সেই সুযোগ নিয়ে চোরাবালিতে ভোট করাবেন। নির্বাচন কমিশন পদক্ষেপ নিলেই আওয়াজ তুলবেন— গেল গেল বাঙ্গালিয়ানা গেল! তার হয়তো বলা উচিত— গেল গেল আরবি-জারিত বাংলা বলা, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীটা, আমার ভোটারটা ধরা পড়ে গেল! নির্বাচন কমিশন রোগ বুঝে চিকিৎসা করছে আর মমতা ব্যানার্জি ভোটব্যাংক হারানোর আতঙ্ক এবং ব্যালট জ্বরে কাতর। তাই রাজনৈতিক ব্যাকরণে সজাগ থেকেই তিনি তার অকৃত্রিম স্বৈরতান্ত্রিক ভঙ্গিমাতে হুকুম দিয়েছেন যেন বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-রা কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ পালন না করেন, কমিশনের কথামতো তাঁরা যেন না চলেন। বিএলও-দের উদ্দেশ্যে ঠান্ডা হুমকি দিয়েছেন যে, নির্বাচন হয়ে যাবে, তারপরতো আপনারা আমার রাজ্যেই চাকরি করবেন। সত্যিই ভয়াবহ তার বাক্যরাজি বা মৌখিক নির্দেশ! নিজের রাজনৈতিক সুবিধার ক্ষেত্রে যা যা অনিয়ম হচ্ছে, তাতে যদি বিন্দুমাত্র নড়চড়ের হাওয়া বোঝেন, তখন যেভাবে রাজনীতির হাওয়া উত্তপ্ত করার দক্ষতা তিনি রাখেন, তা যেন সত্যিই এক দৃষ্টান্ত। যেখানে যত স্বেচ্ছাচার, সেখানে নিয়ম বা আইন-কানুনের প্রয়োগ ঘটলে তার কাছে সেটা ততটাই অগণতান্ত্রিক ঠেকে। বহুমাত্রিক দেশ ভারতে কোনো আইনি বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ মানেই তাতে কিছু জটিলতা, টুকরো টুকরো সমস্যা সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষেরও কখনও কখনও অসুবিধা হয়। দিনের শেষে তা যদি দেশরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয় তবে বুঝতে হবে মমতা ব্যানার্জির এইসব খেলো যুক্তি পলিটিকাল নয়, ব্যালটিকাল। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। 'জেরিম্যানডারিং ইজ আনফেয়ার অ্যান্ড আনডেমোক্রেটিক'। অর্থাৎ নির্বাচনে কারচুপির জন্য অবৈধভাবে নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা পরিবর্তন হলো একটি চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। আমেরিকাতেও জেলা ভোট ম্যানিপুলেশনের উদাহরণ রয়েছে। মমতা ব্যানার্জির জেরিম্যানডারিং-এর অঞ্চল হলো পুরো পশ্চিমবঙ্গ। এই তৃণমূলি জেরিম্যানডারিং-এর চোটে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অনুপ্রবেশ করছে বাংলাদেশ, রাজ্যের জনবিন্যাস সম্পূর্ণ পালটে দেওয়ার মাধ্যমে ছক চলছে বৃহত্তর ইসলামিক বাংলাদেশ গঠনের। মমতা ব্যানার্জি যে ন্যারেটিভ তৈরি করছেন তা শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক চাল নয়। তা হিন্দু, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রকৃত বাঙ্গালি এবং বৃহত্তর আঙ্গিকে অতি অবশ্যই ভারতের সুরক্ষার সঙ্গে তঞ্চকতা। ■

সিউড়ী শহরে সংস্কার ভারতী আয়োজিত লোকসংগীত কর্মশালা

ও ভোলা
স্বরাজ যদি পায় হে ভোলা,
খ্যাতি দিব মানিক কলা
নইলে আইঠ্যা কলা।
অথবা
বানিয়া হইল দ্যাশপতি
কি বুলবো ভাই দ্যাশের গতি
কাঁচ দিয়া কাঞ্চনাদি নেয়
হাতে দিয়া মাটির খোলা।

স্বাধীনতার মাসে সিউড়ী শহরে প্রভাত জ্যোতির্ময়ী কলেজ প্রাঙ্গণে গম্ভীর গানের সুরে লোকগানের কর্মশালার মাধ্যমে ভেসে উঠল স্বাধীনতা-উত্তর যুগের মানুষের দুঃখ দর্দশা ও অভাব অভিযোগের দিনলিপি। গত ২ ও ৩ আগস্ট সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে লোককলা বিধার রাজ্যস্তরের দ্বি-দিবসীয় লোকসংগীত কর্মশালায় প্রশিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি দ্বারা জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লোকসংগীত বিশেষজ্ঞ ড. স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়। দুদিনের এই কর্মশালায় বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪০ জন বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রথমদিনে সংগঠনের ধ্যেয় গীতের মধ্যে দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়। বিশেষ অতিথিরূপে বরণ করে নেওয়া হয় প্রশিক্ষক ড. স্বপন কুমার মুখোপাধ্যায়-সহ পদ্মশ্রী রতন কাহার, সংস্কার ভারতীর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত এবং প্রভাত জ্যোতির্ময়ী জ্ঞানপীঠের কর্ণধার লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং অতিথি বরণের পর কর্মশালার কর্মকাণ্ড শুরু হয়। লোকগান ও লোকসংগীত হলো ঐতিহ্যবাহী সংগীতের ধারা যা নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায় বা অঞ্চলের মানুষের মৌখিক ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে গানের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। গম্ভীরার মতোই ঝুমুর ও ভাওয়াইয়া হলো লোকসংগীতের আর দুটি সমৃদ্ধ অথচ লুপ্তপ্রায় ধারা। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই লোকগানের গুরুত্বকে পৌঁছে দেওয়া এবং ধারাগুলিকে উজ্জীবিত করা। কর্মশালায় প্রতিটি গানের উৎপত্তি, বৈশিষ্ট্য, অঞ্চলভেদে উচ্চারণের রদবদল এবং নানা ভঙ্গিতে সুরের প্রক্ষেপণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। কর্মশালার শেষদিনে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলার স্বনামধন্য সংগীতশিল্পী মানবী সরকার এবং বাসুদেব কর্মকার। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সংগীতপ্রেমী মৌসুক্তি সরকার এবং প্রভাত শিকদার বলেন, এই কর্মশালায় লোকসংগীতের প্রতি অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পেল এবং আগামীতে এরকম আরও কর্মশালার প্রয়োজন রয়েছে। এদিন অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়ার পর কল্যাণমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কর্মশালার পরিসমাপ্তি হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সাধুসন্ত ও ধর্মাচার্য সম্মেলন

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উত্তরবঙ্গের উদ্যোগে গত ৩ আগস্ট উত্তর দিনাজপুর জেলার কানকি ধাম রামদেব বাবা মন্দিরে সাধুসন্ত ও ধর্মাচার্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর সদস্য শ্রীমৎ নির্গুণানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ শিলিগুড়ি শাখার অধ্যক্ষ স্বামী ধর্মাত্মানন্দজী মহারাজ, জনজাতি সমাজের ধর্মগুরু গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু, রাজবংশী ধর্মগুরু অধরানন্দজী, শ্রীরামকৃষ্ণ পরম্পরার স্বামী শিবাত্মানন্দজী মহারাজ এবং ইসকনের জগদার্তিহা প্রভু। সম্মেলনে বিভিন্ন পরম্পরার ৮০ জন সাধুসন্ত ও ধর্মাচার্য অংশগ্রহণ করেন। ধর্মাচার্যগণ হিন্দুধর্ম ও সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য ৬টি বিষয়ের উপর জোর দেন--- (১) হিন্দু সমাদের ঐক্য সাধন। নানা মত, সম্প্রদায় ও ভাষাগত বিভিন্নতাকে কাজে লাগিয়ে দেশবিরোধী শক্তিগুলি হিন্দুসমাজের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত। সব ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করে দেশ ও হিন্দুজাতির ঐক্যসাধনে সাধুসন্তদের কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। (২) হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে দেশের জনবিন্যাসের চরিত্র বিপজ্জনকভাবে পালটে যাচ্ছে। মাতৃশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুটুম্ব প্রবোধনে জোর দিতে হবে। (৩) ধর্মান্তরণ রোধে এবং ধর্মান্তরিতদের পরাবর্তনে উৎসাহ প্রদানে ধর্মাচার্যদের এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় সাধুসন্তদের যাতায়াত বাড়তে হবে। (৪) হিন্দু মঠ-মন্দিরের সংস্কার সাধনের জন্য সংস্কারকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ করা চলবে না। জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। (৫) অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে হিন্দু জনসংখ্যা ১০০ কোটির উপর হলেও পৃথিবীতে কোনো স্বীকৃত হিন্দুরাষ্ট্র নেই। তাই ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে সাধুসন্তদের সোচ্চার হতে হবে। (৬) হিন্দু মঠ-মন্দিরগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে ট্রাস্ট বা সোসাইটির মাধ্যমে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই সম্মেলন সঞ্চালনা করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর সদস্য তথা শিলিগুড়ি কেশবগড় গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ সজ্জন মহারাজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক লক্ষ্মণ বনসল, ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী অনুপ কুমার মণ্ডল এবং বিভাগ সম্পাদক নয়ন আইচ।

মালদহে এবিভিপি-র ছাত্র অধিকার মহামিছিল

গত ৩১ আগস্ট অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে মালদা শহরে ছাত্র অধিকার মহামিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মহামিছিল বিকেল ৩টায় অতুল মার্কেট থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ইংলিশ বাজার থানার সামনে দিয়ে রাজহোটেল হয়ে ফোয়ারা মোড়ে পথসভার পর শেষ হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন এবিভিপি-র মালদহ বিভাগ সংযোজক রূপচাঁদ শীল এবং রাষ্ট্রীয় সম্পাদক অঙ্কিত শুক্লা। জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী এই মহামিছিলে অংশগ্রহণ করেন।

কলকাতা বি কে পাল পার্কে নৃত্যকালীমাতার পূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার শোভাবাজার অঞ্চলে বি কে পাল পার্কে সর্বজনীন নৃত্যকালীমাতার পূজা আজও সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় মহালয়ার এক মাস আগে ভাদ্র মাসের অমাবস্যায়। এই পূজা শুরুর নেপথ্যে এক জনশ্রুতির কথা জানা যায়। দ্বিশতাধিক বছর আগে শোভাবাজার অঞ্চলে গঙ্গা তীরবর্তী বেনিয়াটোলা স্নানের ঘাটে 'মোহনটুনি' নামে একজন শক্তি সাধিকার আবির্ভাব ঘটে। ধ্যানে এই সাধিকার মনে যে মূর্তির উদয় হয়, সেই মূর্তিই 'নৃত্যকালী' মাতা রূপে দুশো ছাপ্পান্ন বছর ধরে পূজিতা হচ্ছেন। সাধিকা 'মোহনটুনি'কে নৃত্যকালী পূজার প্রতিষ্ঠাত্রী হিসেবে গণ্য করা হয়। শোভাবাজার আহিরিটোলা এলাকায় 'মোহনটুনির ঘাট' নামটিও সেই সন্ন্যাসিনীর স্মৃতি বহন করছে। ১১৭৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে (ইংরেজি ১৭৭০ সাল) নৃত্যকালীমাতার পূজার সূচনা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়।

নৃত্যকালীমাতার সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীও আসীন। মধ্যস্থলে শায়িত মহাদেবের বক্ষে নৃত্যরতা মাতৃমূর্তি। দুই পাশে সহচরীদ্বয়— জয়া ও বিজয়া। সম্মুখে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রতীক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং সিদ্ধিদাতা গণেশ। নৃত্যকালীমাতার সঙ্গে সকলেই পূজিত হন। এছাড়া শৌর্য বীর্যের প্রতীক হিসেবে দুই পাশে দুই ঘোড় সওয়ার, নৃত্যগীতের প্রতীক বেশ কয়েকটি পরি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সময়ানুবর্তিতার প্রতীক এক সুদৃশ্য চিল ঘড়ি দেবীর চালচিত্রের শোভাবর্ধন করছে। এরকম অভিনব মূর্তি খুব কম দৃষ্টিগোচর হয়।

বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরী পূজার দিন কাঠামো পূজা হয় এবং রথযাত্রায় প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। বর্তমান কাঠামোটি শতাধিক বছরের প্রাচীন বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। একই পরিবারের মৃৎশিল্পীরা বংশপরম্পরায় প্রতিমা তৈরি করছেন। প্রতিমার সাজসজ্জাও মালাকারগণ পুরুষানুক্রমে করে আসছেন। সুষ্ঠুভাবে নৃত্যকালীমাতার পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করতে ১৩৭২ বঙ্গাব্দে একটি স্থায়ী ভাণ্ডার গঠন করা হয়েছে। অতীতে পূজায় ছাগ, মেঘ ও মহিষ বলিদানের প্রথা ছিল। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ থেকে বলিপ্রথা বন্ধ হয়েছে।

শোভাবাজার অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে পূজা অনুষ্ঠিত হবার পরে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ থেকে বি কে পাল পার্কে নৃত্যকালীমাতার পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২১ আগস্ট থেকে চারদিন ব্যাপী পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পূজাপ্রাঙ্গণে সপ্তাহব্যাপী মেলা বসবে। এবছর পূজা ২৫৭তম বর্ষে পদার্পণ করলো।

২৪ আগস্ট রবিবার সন্ধ্যায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মাতৃপ্রতিমা এলাকা পরিক্রমা করে আহিরিটোলা ঘাটে নিরঞ্জন হবে। পরম্পরা বজায় রেখে তরুণ কর্মীরা উৎসাহ সহকারে প্রতিমা কাঁধে করে গঙ্গাবক্ষে নিয়ে যায়। একই কাঠামোয় দুশো ছাপ্পান্ন বছর ধরে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেজন্য কাঠামো বিসর্জিত হয় না।

নিরঞ্জনের আগে প্রতিমা বরণ এবং সিঁদুর খেলায় পল্লীর মহিলাদের অংশগ্রহণ নৃত্যকালীমাতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। □

যৌগিক দৃষ্টিকোণে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

হিমালয় যেমন অনন্তরত্ন-প্রসবিনী, সাগর যেমন রত্নাকর, তেমনই অনন্তরত্নপ্রভব, রত্নাকর বৈদিক সনাতন ধর্মের দৃঢ় ভিত্তির পশ্চাতে যত রত্নস্বরূপ শাস্ত্র আছে, তাদের কেন্দ্রবিন্দু হলো শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। গীতা বেদমূলক। বেদই গীতাজ্ঞানের বা গীতাধর্মের ভিত্তি। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পার্থকে যে মহাবোধ প্রদান করেন তাই হলো গীতাবোধ। সেজন্যই মহর্ষি বেদব্যাস নিজেই বলেছেন—

'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বত্রচিৎ।।'

যা এতে আছে, তা অন্যত্র আছে, কিন্তু এতে যা নেই, তা অন্যত্র কোথাও নেই। যা নেই ভারতে (মহাভারতে) তা নেই ভারতে (জগতে)। গীতার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সেজন্যই বলা হয় :

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।

যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।।

অর্থাৎ অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন, শুধুমাত্র গীতাপাঠই যথেষ্ট, কারণ গীতা স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখসঞ্জাত। শুধু তাই নয়, এও বলা হয়েছে :

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।

গাভীস্বরূপ উপনিষদ সমূহের দোহনকর্তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, পার্থ বৎস, সুধীজন ভোক্তা ও গীতা হচ্ছেন দুগ্ধ। গীতাপাঠ একপ্রকার গীতাকারেরই অর্চনা। সেজন্যই গীতা সর্বজ্ঞানদায়িনী, সর্বশাস্ত্রের সারভূতা ও পরম-পবিত্র :

'তন্মোঘঃ ধর্মরহিতং বেদবেদান্ত গর্হিতম্।

তস্মাদ্ধর্ম্ময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞান-প্রযোজিকা।।'

(গীতা মাহাত্ম্যম্-১৯)

তবে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত সনাতন ভারতের যোগীশ্রেষ্ঠ যোগাচার্যরা গীতা মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে যা যা বলেছেন, তার সারকথা মাত্র কয়েকটি বাক্যেই বলেছেন বর্তমানকালের যোগীশ্রেষ্ঠ যোগাচার্য শ্রীভগবানজী অর্থাৎ 'মহাকাল', যাঁকে সংবাদমাধ্যম নাম দিয়েছে 'গুমনামীবাবা'। 'চারণিক' কৃত 'ওই মহামানব আসে' (অশেষ), গ্রন্থে-মহাকাল বলছেন 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা— মন্ত্রময়ী। গীতার দিব্য শ্লোকসমূহের অনুষ্ঠান, অমোঘ ফলপ্রদ। যে মন্ত্রের অনুষ্ঠান করতে হবে, প্রথম সেই মন্ত্রটি তিন হাজার জপ করলে ওই গীতামন্ত্র সদাসর্বদার জন্যই সিদ্ধ হয়ে যাবে।' তাই ভগবানজীর প্রসঙ্গ টেনে বলা যায় 'গীতা সনাতনী হিন্দুত্ববোধের জাজ্জ্বল্যমান টীকা স্বরূপ।'

গীতায় ব্রহ্ম যেমন সাকার সগুণ, তেমনই ব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ, নিরাকার সগুণ। শ্রীভগবান গীতার প্রতিটি শ্লোকেই যোগের কথা, যোগীর কথা এবং যোগীর নিজস্ব

উপলব্ধির কথা নিজ শ্রীমুখে ব্যক্ত করেছেন।

গীতার ১৮টি অধ্যায়ে ১৮ প্রকার সাধনার উপদেশ থাকলেও মুখ্য পন্থা হচ্ছে চারটি— কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান ও ভক্তি; আর এর সবগুলিই কিন্তু আদতে কর্ম বা ক্রিয়া। তাই, গীতার প্রতিটি সাধনমার্গই আসলে ক্রিয়া বা কর্মের মার্গ, যা অব্যয় জ্ঞানযোগ।

ইমং বিবস্ততে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।। (৪।১)

শ্রীভগবান বলছেন— এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি আগে সূর্যকে বলেছিলাম। পরে সূর্য নিজপুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই-কূটস্থ। এই কূটস্থের উজ্জ্বল জ্যোর্তিচ্ছটাই সূর্য। প্রাণ বেগযুক্ত হয়ে নীচের দিকে কূটস্থ থেকে নেমে আসে, শেষে মূলাধার চক্র পর্যন্ত নামে। প্রাণ থেকে উৎপন্ন মন, তিনিই মনু। মন ইন্দ্রিয় সংযোগে বহির্মুখে ধাবিত হয় ও পাপযুক্ত হয়। প্রাণ ক্রিয়ার দ্বারা অন্তর্মুখী ও পাপমুক্ত হয়। পাপমুক্ত অবস্থাই ইক্ষ্বাকু।

ঈশ্বর 'অবাঙ্‌মানস গোচর'। তাই এই 'ক্রিয়াসাধনা' বা 'কর্মসাধনা' নিরাকার সাধনা বিশেষ। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের যে ব্যক্ত ভাব তা আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস বা প্রাণ। শাস্ত্রানুসারে :

প্রাণোহি ভগবানীশঃ প্রাণোবিষ্ণু পিতামহঃ।

প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।।

প্রাণই ভগবান। আর, এরই স্থির অবস্থা ব্রহ্মপদবাচ্য। ব্রহ্মরন্ধ্রই পরমাত্মা স্থান। তিনিই যখন সৃষ্টিমুখী হন, নেমে আসেন আজ্ঞাচক্রে। ভ্রূযুগলের মাঝে কূটস্থে। ঈড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্নার মিলন স্থল ত্রিবেণীতে। সেখান থেকেই প্রাণ নামা উঠা করে, চঞ্চলতা আর সৃষ্টির উন্মেষ ঘটে। এই বহির্মুখী শ্বাস যতক্ষণ না অন্তর্মুখী হচ্ছে ততক্ষণ ভগবানের উপাসনা সম্ভব নয়। তারই বিজ্ঞানসম্মত পন্থা প্রাণায়াম। ক্রিয়াযোগ এই পন্থাকেই প্রদর্শন করে, যার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞান। মহাযোগীরাজ শ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীর মতে প্রাণায়ামই একমাত্র কর্ম যার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এটাই বিশেষ রূপ কর্ম, যার সমাসবদ্ধ পদ বিকর্ম এবং যা নিষ্কাম।

ক্রিয়াযোগ অদ্বৈততত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছু নয়। নিজেকে জানাই ব্রহ্মজ্ঞান আর ব্রহ্ম এক বৈ দুই নয়। মানুষ নিজেই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই জ্ঞান ক্রিয়াযোগ থেকেই আসে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন— 'যত মত তত পথ'। কিন্তু ব্রহ্মত্ব বা শিবত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হতে গেলে কূটস্থ থেকে পথ একটাই। শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার বরিষ্ঠ। তিনি চেয়েছিলেন, সাধারণ মানুষ অন্তত কূটস্থ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে অসাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হোক! তা যে কোনো পথ বা সাধন উপায় অবলম্বন করে হতে পারে। কিন্তু কূটস্থ থেকে সহস্রারে মনকে পৌঁছে দেওয়ার রাস্তা একটাই। তাহলো, নিবিড় ক্রিয়াযোগ। সহস্রারে মন স্থিতিলাভ করলে তা থেকে মন কূটস্থে চট করে নেমে আসে না কিন্তু কূটস্থে মন বা শ্বাসকে তুলে আনতে পারলেও সেখান থেকে অনেক সময়ই তা নেমে আসে ও চঞ্চলতার শুরু হয়। সহস্রারে স্থিতিলাভ করাই প্রকৃত নির্বাণ বা ব্রহ্মত্ব অথবা শিবাবস্থা প্রাপ্তি।

গীতায় ৫ম অধ্যায়ের ২নং শ্লোকে শ্রীভগবান বলছেন—

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।

“সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব। এই সর্বধর্ম আসলে ইন্দ্রিয়গুলির ধর্ম। তাই সবরকম ইন্দ্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ করে আত্মকর্ম অর্থাৎ গুরুর উপদেশানুযায়ী ক্রিয়া করলেই সর্ব পাপ থেকে মুক্তি হওয়া যাবে।”

তয়োস্তু কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে।। (৫।২)

অর্থাৎ সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কারণ, ক্রিয়া অর্থাৎ কর্ম না করলে সন্ন্যাস অবস্থা যা মনেরই একটি বিশেষ অবস্থা, তা আসে না আর এই সন্ন্যাস ত্যাগ হয় বা নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে যখন ক্রিয়ার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন মন বলেও কিছু থাকে না! মনস্থির হয়ে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

গীতাতে গীতাকার এই পথেরই বর্ণনা দিয়েছেন, প্রতিটি অধ্যায়কে যোগাধ্যায় উল্লেখ করে। সে কারণেই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগী হবার উপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—

'তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসু কৌশলম্।।'

অর্থাৎ 'যোগে যুক্ত হও, যোগকর্মরূপ কৌশল দ্বারা।' (২।৫০)

গীতার যৌগিক ব্যাখ্যা করতে গেলে যেহেতু তা মহাভারতের অন্তর্গত তাই মহাভারতকেও যৌগিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা জরুরি। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী এবং সিদ্ধ যোগাচার্যগণের ব্যাখ্যায় পঞ্চপাণ্ডব হলো দেহাভ্যন্তরস্থ পাঁচটি তত্ত্বের প্রতীক! মনে রাখতে হবে, শাস্ত্রানুসারে এই দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ। ক্ষিতি (মূলাধার), অপঃ (স্বাধিষ্ঠান), তেজ (মণিপুর), মরুৎ (অনাহত) ও ব্যোম (বিশুদ্ধচক্র)— এই পাঁচটি তত্ত্ব বা চক্রের সমন্বয়ে গঠিত।

সশরীরে স্বর্গে গমন করতে একমাত্র যুধিষ্ঠিরই সক্ষম হয়েছিলেন। কারণ তিনি ধর্মপুত্র। তিনি হলেন ব্যোমতত্ত্ব যার স্থান বিশুদ্ধচক্রে যা অবস্থিত কণ্ঠে। যেখান থেকে মানুষ পৌঁছাতে পারে কূটস্থে বা আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ স্বর্গে বা পরব্রহ্মে। এখানে শূন্যতত্ত্ব মিশে যাচ্ছে মহাশূন্যতত্ত্বে। ভীম দ্বিতীয় পাণ্ডব, যিনি পবনপুত্র। যা অনাহতে অবস্থিত বায়ুতত্ত্ব (মরুৎ)। এই বায়ুতত্ত্বই হল নাদ ব্রহ্ম। অনাহত বা হৃদয়গ্রন্থির ভেদ বা নাদতত্ত্বে সিদ্ধিলাভই যোগীকে পৌঁছে দেয় কণ্ঠের বিশুদ্ধচক্রে। তাই স্বর্গে পৌঁছানোর আগেই দেহের নয়, দেহ বাসনার নাশ ঘটে। ভীম তাই স্বর্গে পৌঁছানোর আগে দেহে ছিলেন না। বিশুদ্ধ চক্রে বা তত্ত্বে মিশে গিয়েছিলেন। তৃতীয় পাণ্ডব বা অর্জুন হলেন তেজস্তত্ত্ব যা মণিপুর বা নাভিতে বর্তমান। এই তেজস্তত্ত্ব বা মণিপুর চক্র ভেদ করতে পারলে বা সিদ্ধ হলে যোগী অবস্থান করেন অনাহতে বা হৃদয়ে। যেখানে মনকে পৌঁছে দিতে পারলে বা মনকে সেখানে স্থির অবস্থানে রাখতে পারলে জ্ঞানলাভ হয়। নকুল জল বা অপঃতত্ত্ব যার অবস্থান স্বাধিষ্ঠানে।

যোগী স্বাধিষ্ঠান থেকে ওঠেন মণিপুরে, তারপর সাধন ক্রমানুসারে আরও উপরে। আর পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব হলেন ক্ষিতি বা মৃত্তিকাতত্ত্বের প্রতীক যা মূলাধারে অবস্থিত। ক্ষিতি বা মূলাধার মিশে যায় উপরের তত্ত্বে অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানে। মূলাধারেই অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনী। যোগী যখন কুলকুণ্ডলিনী বা মূলাধারকে জাগিয়ে তোলেন, তারপর অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে একে একে চক্রগুলি ভেদ করে বিশুদ্ধচক্র থেকে সহস্রারে পৌঁছে যান, তখনই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান বা শিবত্ব তথা কৃষ্ণাবস্থা প্রাপ্ত হন। প্রাণের চঞ্চলতার আরম্ভ যে দিক থেকে সেই দিকের এই পাঁচটি তত্ত্বের সমষ্টিই হলেন দ্রৌপদী। এটাই শ্রীগীতার যৌগিক দৃষ্টিকোণ। প্রকৃত যোগ অর্জুন অবস্থা থেকে শুরু হচ্ছে, কারণ এই পঞ্চপাণ্ডব যোগীর সাধনস্তরের এক একটি অবস্থা। এখন এই অর্জুন অবস্থাটি এমনই একটি অবস্থা যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অন্য পাণ্ডবদের গীতার উপদেশ না দিয়ে বেছে নিলেন শুধু অর্জুনকেই! কারণ, ধর্মরাজ বলে যিনি অভিহিত হন তিনি তো সর্বজন শ্রেষ্ঠ। তবে কি নিছকই সখা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পক্ষপাত! নাকি অর্জুনই ছিলেন যোগ্যতম যিনি মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, দায়িত্ব, বীরত্ব, স্নেহ, মায়া, মমতা, প্রেম, যুদ্ধবিদ্যা, বন্ধুপ্রীতি, ভগবৎপ্রীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই কোনো না কোনোভাবে সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন। অর্জুনের ভগবৎপ্রীতির কথাই যদি ধরা যায়, তবে তাঁর ভগবৎ প্রেম এমনই ছিল যাতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সখা রূপে তিনি লাভ করেছিলেন। অর্জুনের চরিত্র যে কতখানি মহান তা এর থেকেই বোঝা যায়। বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কৃপা করেছিলেন। এই বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো হীনম্মন্যতা ছিল না। আসলে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের চোখে দেখেননি। জন্মান্তরীণ সুকর্মের বলে শ্রীকৃষ্ণকে সখা হিসাবে পাবার পর তিনি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে মুহূর্তের জন্যও পরিহার করেননি। তিনি অনন্যচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে সখা রূপে বরণ করেছিলেন। শ্রীগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (৯।২২)

অর্থাৎ অনন্যচিত্তে যিনি আমার উপাসনা করেন, আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ভক্তের যোগক্ষেম আমিই বহন করি।

অর্জুন সবসময়, সবকাজে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে শ্রীকৃষ্ণকেই জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। সে কারণেই বিশ্বরূপ দর্শন ও গীতাবোধ লাভের সুযোগ তিনি নিজের যোগ্যতাতেই লাভ করেন। যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে একে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, নিষ্ঠাসহকারে ক্রিয়া করলে কৃপা লাভ হবেই।

অথচ যুধিষ্ঠির তো ছিলেন সর্বগুণসম্পন্ন! তিনি তো ধর্মরাজ! তাহলে তাঁর সেই অভ্রংলিহ চরিত্র কেন বিবেচিত হলো না, বিশ্বরূপ দর্শন বা গীতার প্রথম শ্রোতা হিসেবে। তবে কি ধর্মরাজ রূপে সারা জগতের কাছে যশলোভী মনই তাঁর অযোগ্যতার কারণ। নৈতিকতার অভিমানই কি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত আদেশ নির্দেশ বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে তাঁর পথরোধ করত? সে কারণেই কি তিনি বলেছিলেন— 'অশ্বত্থামা হতঃ— ইতি কুঞ্জরঃ।' নির্দ্বিধায় পালন করতে পারেননি শ্রীকষ্ণের নির্দেশ যা ছিল শুধুমাত্র— 'অশ্বত্থামা হতঃ।'

আসলে অর্জুনের স্তর বা অবস্থাই সেই অবস্থা, যে অবস্থা বা স্তরে ক্রিয়ার দ্বারা যোগীকে প্রথমে পৌঁছতে হবে। গুরুর প্রদর্শিত প্রতিটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে নির্দ্বিধায় ও নিঃশর্তে পালন করতে হবে। তবেই নেমে আসবে গুরুকৃপা বা ভগবৎ কৃপা। কৃপার অর্থই হলো করে পাওয়া। সেই কৃপাই তখন খুলে দেবে পরবর্তী চক্রগুলির অতিক্রমের পথ। সেজন্যই স্বয়ং সহস্রার চক্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে শ্রীগীতায় বলেছেন—

সর্বধর্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। (১৮।৬৬)

অর্থাৎ সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে তুমি একমাত্র আমার শরণ নাও, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করব। এই সর্বধর্ম আসলে ইন্দ্রিয়গুলির ধর্ম। তাই সবরকম ইন্দ্রিয়ধর্ম পরিত্যাগ করে আত্মকর্ম অর্থাৎ গুরুর উপদেশানুযায়ী ক্রিয়া করলেই সর্ব পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

তাই তো, মহাবতার বাবাজী মহারাজ, যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী থেকে আরম্ভ করে আজকের যোগসিদ্ধ প্রত্যেক যোগাচার্যের বা গুরু পরম্পরার একটিই উপদেশ— 'ক্রিয়া কর সব পাবে।' ক্রিয়া করলে সব পাওয়া যায়। পাওয়া যায় সেই কাম্য বস্তু যার জন্য এই দুর্লভ মানব জনম। সাধক রামপ্রসাদ সেনও বলে গেছেন এই মানব জমিন অনাবাদি ফেলে না রেখে তাকে শ্বাসরূপ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করে আবাদি করাই মানবজন্মের লক্ষ্য। লাহিড়ী মহাশয় বলেছেন— 'ক্রিয়াই বেদপাঠ, ক্রিয়াই গীতাপাঠ।' যে কারণেই শ্রীগীতার প্রতিটি অধ্যায়কেই যোগাধ্যায় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তাই যৌগিক দৃষ্টিতে শ্রীগীতা একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত যজ্ঞানুষ্ঠান যা কর্ম বা ক্রিয়ার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। □

দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একরাশ বেদনা

সায়ন্তন বসু

যখন আমরা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কিংবা সেই যুগসন্ধিক্ষণের ঘটনাবলি সম্পর্কে আলোচনা করি, তখন এমন অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় যা একমুখী নয়। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে একরাশ বেদনা ও হতাশা। ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁরা নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তাঁরা দেশভাগের কল্পনা কখনো করেননি। স্বাধীনতার এই যুদ্ধে বাঙ্গালির অবদান সর্বাধিক। এই বঙ্গভূমি জন্ম দিয়েছে একের পর এক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের, যেমন ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বিনয় বসু, সূর্য সেন, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রাসবিহারী বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা এবং আরও অনেককে। কিন্তু প্রতিদানে বঙ্গ পেয়েছে এক বিভীষিকাময় বিভাজন। যার যন্ত্রণা আজও হিন্দু বাঙ্গালি বয়ে চলেছে। ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার মধুর স্বাদ আস্বাদন করতে বাঙ্গালি অক্ষম।

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের পর, ব্রিটিশ শাসন বঙ্গে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ থেকে বঙ্গে তাঁরা শাসন চালাতে থাকে, কিন্তু অচিরেই বিদ্রোহের আগুন বঙ্গের আকাশ বাতাস মুখরিত করলো। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ বঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী ভাবনাকে এক নতুন রূপ দিল। বঙ্গের নবজাগরণ এই নতুন রূপের ভাবনাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করালো। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই সময়েই লেখা হলো আনন্দমঠ। এই উপন্যাস বঙ্গের জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমকে নতুন করে প্রতিভাত করলো। বন্দেমাতরম সংগীত বাঙ্গালির মনে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের এক নতুন জোয়ার তৈরি করলো। আনন্দমঠে বর্ণিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং বন্দেমাতরম গান ব্যাপক জনজাগরণ সৃষ্টি তথা জাতীয়তাবোধের এক নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করলো। সরকারের দমনমূলক নীতি এই জনজাগরণকে আরও নিবিড় করলো। সাধারণ মানুষের উপর ব্রিটিশের অত্যাচার প্রকট হতেই বঙ্গের যুবসমাজ পথে নামলো। মুখে বন্দেমাতরম, হৃদয়ে বিবেকানন্দের অগ্নিমন্ত্র নিয়ে হাজার হাজার যুবক জীবন দিতে প্রস্তুত হলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যিনি সমাজ নির্মাণে সবথেকে বেশি প্রভাব রেখেছিলেন তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের লেখা পড়ে সেদিন তরুণসমাজ ব্রিটিশের শাসন থেকে মুক্তি পেতে পথে নামলো। বিবেকানন্দের প্রভাব যুবসমাজের মধ্যে আজও সর্বাধিক। তাইতো প্রখ্যাত দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁকে কবিগুরু বলেছেন যে, যদি ভারতকে জানতে হয় তবে বিবেকানন্দের ভাষণ পড়তে হবে। এই শতাব্দীতেই অত্যাচারী ব্রিটিশ

ফঃ ৫

শাসকের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে দেশ জুড়েই আন্দোলন শুরু হয়। মহারাষ্ট্র ও বঙ্গপ্রদেশ এই বিষয়ে ছিল পথিকৃৎ। মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হতে লাগল।

যখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বঙ্গে চূড়ান্ত রূপ নিচ্ছে তখন সরকার এক কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। বঙ্গ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রে, তাই তাঁরা বঙ্গ বিভাজনের সিদ্ধান্ত নিল। মূলত রাজনৈতিক আন্দোলনকে দুর্বল করা এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছুটা সুবিধা দিতেই এই সিদ্ধান্ত। আজকের বাংলাদেশ, অসম নিয়ে হলো পূর্ববঙ্গ। এবং বিহারের, ছত্তিশগড়ের আর বাকি বঙ্গের অংশ নিয়ে গঠিত হলো পশ্চিমবঙ্গ। এই সময় তিন ধরনের ব্যক্তিত্ব বঙ্গের রাজনীতিতে ছিলেন। বুদ্ধিজীবী, বিদ্যালয় শিক্ষক ও ছাত্র। বুদ্ধিজীবীরা মূলত ছিলেন অধ্যাপক ও সাংবাদিক। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি, ছাত্ররা ছিল সমস্ত ধরনের সমাজের অংশ। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাঙ্গালি একজোট হলো। এই তিন শ্রেণী একসঙ্গে এল।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৮৫৭-এর পর ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে সব থেকে ব্যাপক ও সংগঠিত আন্দোলন। হিন্দুসমাজের সমস্ত শ্রেণী এই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ করতে রাস্তায় নামলেন। তিনি রাখিবন্ধন উৎসবে শামিল হলেন। সমাজের সর্বস্তরে রাখিবন্ধন পালিত হলো। কবি কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের নবাবকে রাখি পরাতে গেলে, তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাখি পরেন, কিন্তু ফলস্বরূপ পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়, ইমামকে জোর করে রাখি পরানো হয়েছে এই অভিযোগে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন এত প্রভাবশালী ছিল যে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার একে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। এই আন্দোলনের ফল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতার উত্থান। এই আন্দোলনের ফল অনুশীলন সমিতি, প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত।

বড়লাট কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করলো। বিপ্লবীরা তৎকালীন গভর্নর জেনারেল স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করার একাধিক চেষ্টা করে, কিন্তু অসফল হয়। একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে বিহারের মজফফ্‌রপুরে। অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া বোমাতে ২ জন নিরীহ ব্রিটিশ মহিলা নিহত হলেন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসি হলো, বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করলেন, প্রকারান্তরে তাকে খুন করা হলো বিহারের মোকামা স্টেশনে। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বঙ্গের জনমানসে পড়েছে। অনুশীলন সমিতির জন্ম এই সময়েই। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং বঙ্গভঙ্গ রদ এই সমিতির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ বাতিল করলো কিন্তু একইসঙ্গে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লি স্থানান্তরিত হলো। এই বঙ্গভঙ্গের সুদূরপ্রসারী প্রভাব এখনো আমাদের জীবনে বিদ্যমান। মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ মুসলমান ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গকে সমর্থন করেছিল, কিন্তু হিন্দুরা এর তীব্র বিরোধী ছিল। হিন্দুরা তাই স্বদেশী আন্দোলন, বয়কট প্রভৃতি বিভিন্ন আন্দোলনে শামিল থেকেছে, কিন্তু মুসলমানরা ছিল নিতান্ত দর্শক ও সরকারপন্থী।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করেও বঙ্গের অসন্তোষকে দমানো গেল না। একের পর এক বিপ্লবী আন্দোলন এবং ব্রিটিশ বিরোধী জনজাগরণ এখানে সংগঠিত হতে লাগল। একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন, অন্যদিকে অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড আয়োজিত হতে লাগল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তরের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসও বঙ্গে তখন খুবই শক্তিশালী। জাতীয় কার্যক্রমের সমস্ত কিছুতেই বঙ্গের অংশগ্রহণ থাকত। ইতিমধ্যেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বঙ্গের জাতীয় জাগরণ হয়েছে, কবিগুরু সেই উপলক্ষ্যে একটির পর একটি গান লিখেছেন। যেমন— 'বাংলার মাটি বাংলার জল, পুণ্য হউক পুণ্য হউক, হে ভগবান', কিংবা 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'। এই গানগুলি বঙ্গের জাতীয় জীবনের চেতনা হিসেবে প্রতিভাত হলো।

১৯১১-এর পর থেকে বঙ্গে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আরও তীব্র হলো। বঙ্গপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবের বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ স্বরাজের দাবি করলেন। বালগঙ্গাধর তিলক সর্বপ্রথম বললেন, 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। কংগ্রেস দল অনেক পরে ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে প্রথমবার পূর্ণ স্বরাজের দাবি জানায়। তার আগে তারা স্বায়ত্তশাসন জাতীয় কোনো ব্যবস্থার পক্ষে ছিল। কিন্তু বঙ্গের জনগণ চিরকাল পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে ছিল। এই সময়কালের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একের পর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটান। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, মহাকরণের অলিন্দ যুদ্ধ, বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিককে হত্যা, কলকাতা পুলিশের, গোয়েন্দা ব্যবস্থার উপর একাধিক আঘাত, এই ধরনের অনেক ঘটনা এই তিন দশকে ঘটে। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি মানুষের ভরসা এই তিন দশকেই অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি দেশের সর্বোচ্চ নেতা ছিলেন। তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন সারা দেশের মতো বঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই ক্রমাগত আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন দেশ স্বাধীন হলো। এর মাঝে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, তিনি দেশ ছেড়েছেন এবং জাপানে রাসবিহারী বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে নৌ-বিদ্রোহ হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়লাভ করলেও ইংরেজদের ভারত থেকে চলে যেতে হয়েছে। এর মধ্যে পাকিস্তানের দাবি উঠেছে। এই দাবি শুধু জিন্না নন, কমিউনিস্টরাও এই তুলেছে। বঙ্গের মুসলিম লিগ ১৯০৬ সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকেই এই দাবির প্রবল দাবিদার। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ মুসলিম লিগ ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এটা বাস্তব সত্য যে বঙ্গের মুসলমানরা ১৯০৫-র বঙ্গবিভাগ এবং ১৯৪৭-এ দেশ বিভাগকে সমর্থন করেছিল।

জিন্নার বক্তব্য ছিল, যে প্রদেশে মুসলমান বেশি, সেই প্রদেশ পাকিস্তানের অংশ হবে। যেমন বালুচিস্তান, পেশওয়ার, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পঞ্জাব ও বঙ্গ। যদিও জিন্নার আগে ২০-এর দশকে এই দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন 'সারে জাহাসে

আচ্ছা'র রচয়িতা মহম্মদ ইকবাল। কমিউনিস্টরা ১৯৪১-৪২ সালে তাদের মুখপত্র পিপলস ডেমোক্রেসিতে পাকিস্তানের দাবিতে শুধু সোচ্চার হয়নি, তাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিসি জোশী ভারতকে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত করার পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয়রা এক জাতি নয়, বরং তাঁরা বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতির সমাহার। জিন্নার এই সূত্রের বিরোধিতা করেন হিন্দু মহাসভা নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. এনসি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তাঁরা যুক্তি দেন যে জেলায় হিন্দু বেশি সেখানে তাহলে কী হবে? বাকি প্রদেশ নিয়ে সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল বঙ্গ ও পঞ্জাব নিয়ে। এই প্রদেশ দুটোর প্রচুর জেলা হিন্দু অধ্যুষিত, কিন্তু প্রদেশে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন এই দুই প্রদেশের হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে।

যখন এই প্রশ্ন উঠছে, তখন শরৎচন্দ্র বসু, অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দির সঙ্গে মিলে একটি নতুন অভিমত দেন। তা হলো স্বাধীন বঙ্গ অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গ। অনেকেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এই স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাবিত সংবিধানে বলা হয় যে, নতুন দেশের রাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন সংখ্যালঘু হিন্দুরা। যদিও সরকার চলবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, নতুন বঙ্গ গঠিত হলেই সেখানকার হিন্দুরা বিতাড়িত হবেন, দেশটি পাকিস্তানের সঙ্গে মিলে যাবে, ফলে বিপদে পড়বে অবিভক্ত বঙ্গের ৪৬ শতাংশ হিন্দু জনগণ। গান্ধীজী প্রথমে শরৎ বসুর কথায় প্রভাবিত হলেও পরে পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের পক্ষেই মত দেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গের হিন্দুদের জন্য একটি হোমল্যান্ড চান, যার নাম পশ্চিমবঙ্গ। তাঁর এই দাবিকে সমর্থন করেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, সংখ্যাতত্ত্ববিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ব্যারিস্টার এনসি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০ জুন ১৯৪৭-এ, বঙ্গের আইনসভায় ভোটাভুটি হয়, স্বাধীন বঙ্গ না পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে। ভোটাভুটি ৩ দফায় হয়, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার হিন্দু বিধায়করা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ভোটদান করেন, যদিও

যে বঙ্গ স্বাধীনতার জন্য এত কিছু করলো, সেই বঙ্গ খণ্ডিত হলো। প্রায় ২ কোটি হিন্দু এই ঘটনার ফলে কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আজও তার ফলাফল বিদ্যমান।

মুসলমান বিধায়করা স্বাধীন বঙ্গের পক্ষে ভোট দেন। যেহেতু হিন্দু এবং মুসলমান বিধায়কদের ভোটাভুটির ফল ভিন্ন হলো, তাই পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের পথ প্রশস্ত হলো।

এরপর ১৯৪৬-এর আগস্ট মাসে জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ঘোষণা করেন। ১৬ তারিখ সেই দিন নির্দিষ্ট হয়। এর আগে বঙ্গভূমি দীর্ঘ সময় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ করেছে, কিন্তু কয়েকদিন পরের ১৬ আগস্ট কলকাতার হিন্দু নরসংহারের এবং মুসলমান সমাবেশের দিনের ঘটনা সবকিছুকে হার মানিয়ে দিল। তারপর ওই বছরই লক্ষ্মীপূজার দিন নোয়াখালির জমিদার বাড়িতে হামলা চালাল স্থানীয় মুসলমানরা, পরে তা ব্যাপক আকার নেয়। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট সমাবেশের মুহূর্তে সারা কলকাতা জুড়ে হিন্দুদের উপর এল ভয়ানক আক্রমণ। তৎকালীন বঙ্গের সর্বাধিনায়ক সুরাবর্দি পুলিশকে পুরো নিষ্ক্রিয় করে রাখেন। এর ফলস্বরূপ এই দুই স্থান মিলিয়েই প্রায় ১ লক্ষ হিন্দু মারা যায়।

এর পরিস্থিতিতে দেশ বিভাজনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। বঙ্গ ও পঞ্জাবের খণ্ডিত অংশ ছাড়া বাকি ৫ প্রদেশ নিয়ে হলো পাকিস্তান। কংগ্রেস এই প্রস্তাব মেনে নিল কংগ্রেসের শুধুমাত্র একজন নেতা প্রকাশ্যে এই বিভাজনের বিরোধিতা করেছেন, তিনি হলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের নেতা খান আব্দুল গফ্ফর খান। স্বয়ং গান্ধীজী আর জওহরলাল নেহরু নিশ্চুপ রইলেন। ১৯৪৭-এর জুনে মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব অনুসারে কংগ্রেস এই বিভাজনকে মান্যতা দিল। বিকল্প হিসেবে ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব ছিল। যা অখণ্ড ভারতকে এক রাখত, কিন্তু সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো হতো, অর্থাৎ যে কোনো প্রদেশ চাইলেই বেরিয়ে যেতে পারত। শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসকে আবেদন করলেন অখণ্ডতার স্বার্থে এই প্রস্তাব মানার জন্য, কিন্তু তাঁরা অস্বীকার করলেন।

নতুন একটি জটিলতা তৈরি হলো বঙ্গ নিয়ে। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদ কোথায় যাবে? কলকাতা ছিল দ্বিতীয় লন্ডন, তাকে জিন্না পাকিস্তানের রাজধানী বানাতে চাইলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভার এবং কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতারা এর বিরোধিতা করলেন। কলকাতা চলে গেলে গঙ্গার পূর্ব ভাগের পুরোটাই চলে যাবে, তাই কলকাতা দেওয়া হলো না। তাঁর পরিবর্তে শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্জাবের লাহোর দেওয়া হলো। মুর্শিদাবাদ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু মুর্শিদাবাদ চলে গেলে গঙ্গার জলের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে, তাই মুর্শিদাবাদ শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব অনুসারে পশ্চিমবঙ্গেই থাকল, আর মুর্শিদাবাদ না থাকলে, উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গের সরাসরি যোগাযোগ সম্ভব হতো না। এর কৃতিত্ব অবশ্যই শ্যামাপ্রসাদ পাবেন। বঙ্গকে নিয়ে এত সমস্যার কারণেই চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী বলেছিলেন, 'প্রথমে বাকি দেশ স্বাধীন হয়ে যাক, বঙ্গ নিয়ে পরে ভাবা যাবে'।

যে বঙ্গ স্বাধীনতার জন্য এত কিছু করলো, সেই বঙ্গ খণ্ডিত হলো। প্রায় ২ কোটি হিন্দু এই ঘটনার ফলে কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আজও তার ফলাফল বিদ্যমান। জীবনের সবকিছু হারিয়ে, শুধু ধর্ম রক্ষা করার জন্য হিন্দু বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গে স্থান নিয়েছে। ১৯৫১ সালে, যে পূর্ববঙ্গে হিন্দু ছিল ৩৮ শতাংশ আজ তা ৭.৮ শতাংশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ মনে রাখেনি অশ্বিনীকুমার দত্তকে, মনে রাখেনি গণেশ ঘোষকে, মনে রাখেনি বিনয়-বাদল-দীনেশকে। এই স্বাধীনতা বাঙ্গালি হিন্দুকে পরিত্রাণ দিতে পারেনি, মুক্তিও নয়। □

মমতা ব্যানার্জির হাত ধরে নতুন দ্বিজাতি তত্ত্ব, বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালি

বিশ্বপ্রিয় দাস

আবার একটা নোংরা খেলায় মেতেছে রাজ্যের শাসক দল। একটি দলের সবচেয়ে ঘৃণিত একটি চাল। যে চাল আমাদের রাজ্যে শুধু নয়, সারা ভারতে দ্বিজাতি তত্ত্বের সৃষ্টি করতে চলেছে। একটি বাঙ্গালি, অন্যটি অবাঙ্গালি। মুখ্যমন্ত্রী বাংলাভাষা বললেই, তাঁকে বাঙ্গালি হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলা হচ্ছে বলেছেন। আমাদের এই রাজ্যে বহু অবাঙ্গালি আছেন, যারা বংশ পরম্পরায় এই রাজ্যের সংস্কৃতি, এই রাজ্যের ঐতিহ্যের পূজারি। তাঁদের মাতৃভাষা কারোর হিন্দি, কারোর ভোজপুরি, কারোর ওড়িয়া, কারোর তামিল, কারোর অসমীয়। তাঁরা কেউ বাঙ্গালি নন মুখ্যমন্ত্রী ভাষায়। আজ নিজের রাজ্যে তো বটেই অন্য রাজ্যেও তিনি বাঙ্গালি ও অবাঙ্গালিদের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ লাগাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

রাজ্যের বাইরে থাকা কয়েকজন বাঙ্গালি এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরাও স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর এই প্রথম আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের রাজনৈতিক উসকানিতে। তাঁদের মতে, তাঁদেরকে সেই রাজ্যের সরকার সম্মান দিয়ে পালন করে। তাঁদের সন্তান থেকে পরিবার, পরিজন সবাই বছরের পর বছর সুখে শান্তিতে আছেন। সেই জায়গাতে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের বাঙ্গালি প্রীতির নামে অবাঙ্গালিদের অন্য এক জাতিতে ফেলে আলাদা করে দেওয়ার এই যে মনোভাব, সেটা কি অন্য রাজ্যের মানুষ ভালো চোখে দেখবেন? নিশ্চয়ই নয়। সারা দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, এই বাঙ্গালি প্রীতি তাদেরকেও সমস্যায় ফেলেছে। এ রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। রোজগারের সুযোগ নেই। তাই তাঁদের ঘর ছেড়ে অন্য প্রদেশে গিয়ে পরিবারের জন্য দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করতে হচ্ছে। এই লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে ফিরে আসার ডাক দিয়েছেন। এই লক্ষ লক্ষ মানুষ ফিরিয়ে এনে, তাঁদের হাতে কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কী কাজ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী? মুম্বইয়ে কাজে যাওয়া হাওড়া, মেদিনীপুরের স্বর্ণশিল্পীদের কি ১০০ দিনের কাজ দেবেন? নাকি সিভিক পুলিশ বানাবেন? সে সুযোগ আছে কি এই রাজ্যে?

মুখ্যমন্ত্রী বাঙ্গালি তত্ত্ব খাড়া করেছেন। কীসের ভিত্তিতে করেছেন? তাতেও মিথ্যাচার আছে। সারা দেশে নাকি বাংলাভাষা বললেই, তাঁকে ডিটেনশন ক্যাম্প পাঠানো হচ্ছে। কতবড়ো মিথ্যাচার। মুম্বাই দিল্লি, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ সমেত সারা দেশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী কাজ করছেন বিভিন্ন সেক্টরে। কই, তাঁদের তো হেনস্থা হতে হচ্ছে না। এই প্রতিবেদক জিজ্ঞেস করেছিল বিষয়টা নিয়ে। তাঁদের উত্তর, পশ্চিমবঙ্গে গেলে কী পাবো? আমরা এখানে খুব ভালো আছি। সবাই তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান দেয়। ওখানকার প্রতিবেশীরা যে কোনো অনুষ্ঠানে তাদের আমন্ত্রণ জানায়। বাঙ্গালিদের বিভিন্ন সংগঠন আছে। তাঁদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, কোনোরকম অসুবিধা আছে কিনা। তাদের উত্তর। না, কোনো অসুবিধা নেই। ফলে সারা দেশের এই রাজ্যে থেকে যাওয়া বাঙ্গালিরা এটাকে এক ভয়ংকর খেলা হিসেবে ভাবতে শুরু করেছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা যেটা বলছেন, সেটা আরও ভাববার বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সার্বভৌমত্বের ধার ধারে না। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক একটা সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বাঙ্গালি দরদ উথলে উঠছে। প্রশ্ন হলো, এই বাঙ্গালি কারা? সব রাজ্যেই নির্দিষ্ট ভাবে অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করেছে। যারা অনুপ্রবেশকারী, যাঁদের কাছে ভারতীয় হিসেবে কোনো নাগরিকত্বের প্রমাণ নেই। তারা যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিচ্ছে। এবার হয়তো প্রশ্ন উঠবে, যে বেছে বেছে বাংলাভাষী কেন? ভারতে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলাদেশি মুসলমানদের। এরা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে আবার একটা ট্রেন্ড দেখা যাচ্ছে। এখানে ভিসা নিয়ে বেড়াতে এসে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়েকে রেখেও চলে যাচ্ছে। পরে সেই মেয়ের মাধ্যমে পয়সা দিয়ে, এজেন্ট ধরে, কাউন্সিলরের সার্টিফিকেট নিয়ে, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, এমনকী প্যান কার্ড বানিয়ে ফেলছে। দেখা গেছে এরা সবাই বাংলা ভাষায় কথা বলে। একটি দেশের আর্থিক পরিকল্পনা, সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনা সব ধাক্কা খায় এই অনুপ্রবেশের জন্য। বাংলা ভাষায় কথা বলছে বলে এরা কেউ পশ্চিমবঙ্গবাসী নয়। যদি পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র হয়, তাহলে সারা ভারতের এক কণা মাটির ওপরও তাঁদের সমান অধিকার আছে। সে ভারতের যে কোনো বিষয়ের ওপর নিজের অধিকার দাবি করতে পারে। এই অধিকার তাঁকে সংবিধান দিয়েছে। অন্য দেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের সেটা কিন্তু দেয়নি। বাংলা বললেই কেউ বাঙ্গালি নয়। এটা মানতেই হবে মুখ্যমন্ত্রীকে। এই বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালিদের লড়িয়ে দেবার যে খেলা খেলতে শুরু করেছেন, তাতে মুখ্যমন্ত্রী মারাত্মক ক্ষতি করছেন বাঙ্গালিদেরই। এরপর কোনো অবাঙ্গালি প্রতিষ্ঠানে আর বাঙ্গালিরা সুযোগ পাবেন না চাকরির। অন্য রাজ্যে গেলে বাঙ্গালিদের ভাগ্যে অসম্মান জুটবে। বাঙ্গালি বনাম অবাঙ্গালির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে মুখ্যমন্ত্রী আরেকটি দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করছেন। যে তত্ত্ব আপামর বাঙ্গালিকে এক অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিতে চলেছে। □

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন : নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবিক ভারসাম্যের চালেঞ্জ

উত্তম অধিকারী

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) মাঝে মাঝে 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' বা SIR (Special Intensive Revision) প্রক্রিয়া চালু করে। এই বছর জুন-জুলাইয়ে বিহারে এই প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নের পর এবার পশ্চিমবঙ্গে তার প্রয়োগ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক, জনমত নিরাপত্তা- সংক্রান্ত নানা আলোড়ন। এই প্রবন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করব— পশ্চিমবঙ্গে SIR কেন প্রয়োজন, বিহারের অভিজ্ঞতা কী ছিল, তৃণমূল কংগ্রেস কেন এর বিরোধিতা করছে এবং এর মধ্যে ধর্মীয় নিপীড়িতদের মানবিক অধিকার কীভাবে রক্ষিত হতে পারে।

বিহারের অভিজ্ঞতা : SIR-এর বাস্তব প্রভাব :

বিহারে গত ১ আগস্ট নির্বাচন কমিশন দ্বারা SIR যে খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে ৬৫ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেছে। SIR হওয়ার আগে বিহারের ভোটার ছিল ৭ কোটি ৮৯ লক্ষ, বর্তমানে তা হয়েছে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ। এই নিয়ে সরকার বিরোধী দলগুলি উষ্মা প্রকাশ করলেও, নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিহারের ২৪৩টি বিধানসভার ৯০ হাজার ৭১২টি বুথের ভোটারদের বিস্তারিত বিবরণ প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কোনো আপত্তি থাকলে আগামী ১ মাস অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিতে। অর্থাৎ বিহারে SIR প্রক্রিয়া যথেষ্ট স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই ব্যাপক পরিসরে ভোটার পরিচয় যাচাই বিহারে নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপট : অনুপ্রবেশ, দ্বৈত ভোটার কার্ড এবং নিরাপত্তা সংকট :

পশ্চিমবঙ্গ দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন একটি সংবেদনশীল রাজ্য। এখানে ধারাবাহিকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে এবং রাজনৈতিক সুবিধার জন্য একাংশ বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের অবৈধভাবে ভোটার তালিকায় যুক্ত করছে। সম্প্রতি একাধিক অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে যাদের কাছে ভারত ও বাংলাদেশ— উভয় দেশের ভোটার কার্ড রয়েছে। এটি স্পষ্টতই এক আন্তর্জাতিক জালিয়াত চক্র, যা দালাল, কিছু রাজনৈতিক কর্মী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের যোগসাজশে সক্রিয়। এর প্রভাবে শুধু নির্বাচন ব্যবস্থার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না, জাতীয় নিরাপত্তাও চরম বিপদের মুখে পড়েছে।

ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হিন্দু শরণার্থীদের মানবিক প্রশ্ন :

বাংলাদেশে বিশেষ করে সাম্প্রতিক হাসিনা সরকারের পতনের পর সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলা, লুটপাট, ধর্মান্তর ও হত্যার ঘটনা বেড়ে গিয়েছে। এই কারণে বহু হিন্দু পরিবার পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা একদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে, অন্যদিকে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক হিন্দু শরণার্থী সহানুভূতি নীতির বিরুদ্ধেও যাবে। তাই এসআইআর প্রক্রিয়ায় মানবিক সংবেদনশীলতাও বজায় রাখা জরুরি।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা : রাজনীতি না জনগণের স্বার্থ?

তৃণমূল কংগ্রেস এসআইআর-এর ঘোরতর বিরোধিতা করছে, যার পেছনে কিছু সুস্পষ্ট রাজনৈতিক ও ভোটব্যাংক সংক্রান্ত কারণ রয়েছে : ১. অনুপ্রবেশকারী ভোটারদের একটি বড়ো অংশ তৃণমূলের ভোটব্যাংক বলে অভিযোগ রয়েছে। তাদের তালিকা থেকে বাদ পড়লে রাজনৈতিক ক্ষয় হতে পারে। ২. 'ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে'— এই অভিযোগ তুলে মুসলমান ভোটারদের মন জয় করার প্রচেষ্টা চলছে। ৩. তৃণমূল দাবি করছে, এটা এনআরসি-র মতো একটি প্রকল্প এবং পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভোটব্যাংক রাজনীতির অংশ। যদিও কমিশন বহুবার বলেছে— এসআইআর হলো সম্পূর্ণ আইনি ও নিরপেক্ষ ভোটার যাচাই প্রক্রিয়া, ধর্মীয় ভিত্তিতে নয়। তবে প্রশ্ন থেকে যায়— যদি প্রকৃত নাগরিক হন, তবে এসআইআর-এ ভয় কীসের?

এসআইআর : শুধুই ভোটার তালিকা সংশোধন নয়, নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র রক্ষার অস্ত্র। বর্তমানে এসআইআর কেবল একটি ভোটার যাচাই প্রক্রিয়া নয়, বরং পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা, অনুপ্রবেশ রোধ, সন্ত্রাসবাদ ও জালিয়াত চক্রের উৎস অনুসন্ধান, ভোট ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা। এর জন্য এটিই একমাত্র পথ। যদি এই প্রক্রিয়া কার্যকর হয়, তবে জাল ভোটার চক্র ভেঙে যাবে, ভোটব্যাংক ভিত্তিক রাজনীতি দুর্বল হবে এবং প্রকৃত ভোটারদের মর্যাদা ফিরবে।

সুপারিশ ও করণীয় :

হিন্দু শরণার্থীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে যাচাই করা হোক।

প্রতিটি ব্লকে সমাজকর্মী ও নিরপেক্ষ প্রতিনিধি রাখার মাধ্যমে এসআইআর পরিচালিত হোক। যেকোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক পক্ষপাত এড়িয়ে শুধুমাত্র বৈধ নাগরিকত্ব ভিত্তিক যাচাই নিশ্চিত হোক।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ সমন্বয়ে সংবেদনশীল অঞ্চলগুলোতে বিশেষ নজরদারি চালানো হোক।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার সঠিক প্রয়োগ একদিকে যেমন দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, তেমনই ভোটার তালিকার ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ রূপ গঠনে সহায়তা করবে। তবে এই প্রক্রিয়াকে শুধু রাজনৈতিক লড়াইয়ের হাতিয়ার বানিয়ে তৃণমূলের মতো কিছু দল যদি বিরোধিতা করে, তাহলে একদিকে জাতীয় নিরাপত্তা এবং অন্যদিকে গণতন্ত্র দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের উচিত— সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে, তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে সঠিকভাবে এসআইআর প্রয়োগ করা, যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ একটি নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।

(লেখক : অধ্যাপক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও নির্বাচনী গবেষক)

দূরের পথে একা যেতে নেই

বহুকাল আগে এক নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক যুবক বাস করত। পরিবারে ছিল শুধু তার মা। মাকে সে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। একদিন যুবককে কোনো একটা কাজে দূরের এক গ্রামে যাওয়ার দরকার পড়ল। অনেক দূরের গ্রাম। এতটা পথ একাই তাকে যেতে হবে। রওনা হবার সময় তার মা বলল, বাছা, এতটা পথ একা যাবে, তুমি বরং সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও। একজন সঙ্গী থাকা ভালো।

ব্রহ্মদত্ত হেসে বলল, ভয় কী মা? এ রাস্তাটায় কোনো বিপদের ভয় নেই। তাছাড়া এখন তো কাউকে পাওয়াও যাবে না।

মা কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি। এই বাড়ির পেছনে পুকুরের পাড় থেকে একটা কাঁকড়া ধরে নিয়ে এসে বলল, বাবা, একাই যখন যাবে, এই কাঁকড়াটাকে নিয়ে যাও।

ব্রহ্মদত্ত মায়ের কথা শুনে একটু মুচকি হেসে কাঁকড়াটাকে দুহাতে ধরে সেটা একটা কর্পূরের পুঁটলি সমেত একটা হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিল।

মাকে প্রণাম করে ব্রহ্মদত্ত রওনা হলো। যেতে যেতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো। হাঁটতে হাঁটতে তার পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। মাথার উপরে গ্রীষ্মের সূর্যটা গনগন করছে। ব্রহ্মদত্তের পা আর চলে না। সে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পথের পাশে একটা বড়ো গাছের নীচে ছায়ায় বসে পড়ল। পথশ্রমের ক্লান্তিতে আর ঝিরঝিরে হাওয়ায় তার চোখের পাতা বুজে আসতে লাগল। ব্রহ্মদত্ত আর চোখ খুলে রাখতে না পেরে গাছতলায় শুয়ে পড়ল। একটু পরেই গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

এই গাছটার কোটরে থাকত এতটা কেউটে সাপ। কর্পূরের গন্ধ পেয়ে সাপটা গাছের কোটর থেকে ধীরে ধীরে নেমে এল মাটিতে। তারপর ব্রহ্মদত্তের দিকে না গিয়ে সেই হাঁড়িটার মধ্যে ঢুকে গেল। হাঁড়ির ভেতরে ছিল কর্পূরের পুঁটলি। সাপটি কর্পূরের সন্ধান করতে লাগল। আর সেই সময় কাঁকড়া লম্বা দাঁড়া দিয়ে চেপে ধরল সাপের গলা। একসময় গলাটা কেটে গিয়ে সাপটি মরে গেল।

একটু পরেই ব্রহ্মদত্ত ঘুম ভেঙ্গে দেখে একটা বড়ো সাপ তার মাথার কাছেই মরে পড়ে আছে। তার পশেই সেই হাঁড়িটা যার মধ্যে কাঁকড়াটি ছিল। ব্রহ্মদত্ত বুঝতে পারল

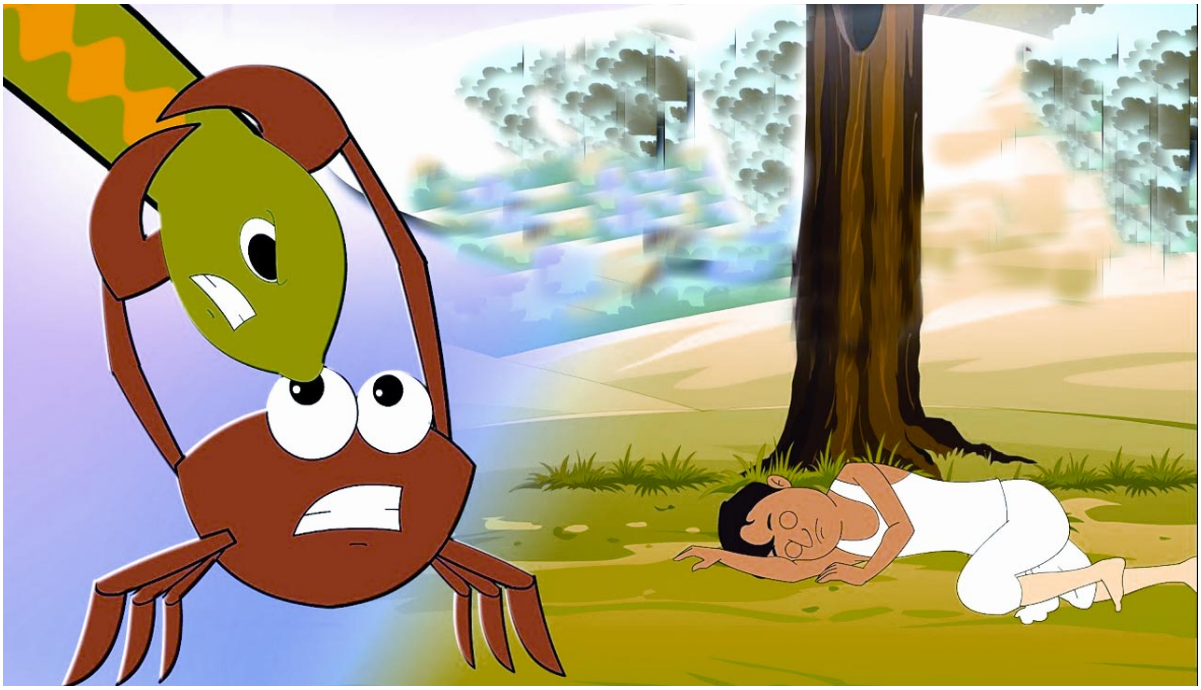

কাঁকড়াটাই ওই সাপটিকে মেরে ফেলে তাকে বাঁচিয়েছে।

ব্রহ্মদত্ত মনে মনে মায়ের উদ্দেশে দুই হাত জোড়া করে প্রণাম করল। মা তো ঠিক-ই বলেছিল, কখনো দূরের পথে একা যেতে নেই. কাউকে সঙ্গে নিতে হয়। কারণ বিপদ যে কোথা থেকে আসবে কেউ তা আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে না। ভাগ্যিস, সে মায়ের কথা শুনেছিল। সামান্য কাঁকড়াও যে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। মায়ের উদ্দেশে আবার একবার দুই হাত জড়ো করে প্রণাম করে ব্রহ্মদত্ত তাড়াতাড়ি উঠে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হলো।

পৃথ্বীরাজ সেন

জাতীয় উদ্যান

ইন্দ্রাবতী

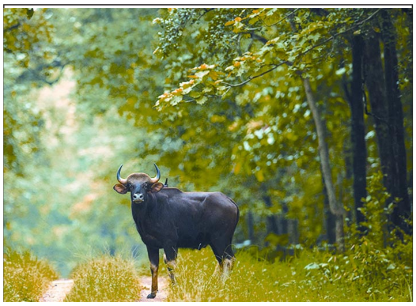

ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান ছত্তিশগড় রাজ্যের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত। ইন্দ্রাবতী নদী থেকে এই উদ্যানের নামকরণ হয়েছে। ১২৫৮ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই উদ্যানের বিস্তৃতি। এই উদ্যানে বাঁশ, সরাই ও সেগুনগাছের আধিক্য রয়েছে। সাধারণ গাছগুলির মধ্যে রয়েছে লেন্ডিয়া, সালাই, মহুয়া, কেন্দু, সিমুল, হালদু, বোয়ার ও জামগাছ। জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে হাতি, বাইসন, নীলগাই, কৃষ্ণসার হরিণ, চারশিংওলা হরিণ, সম্বর, বাঘ, চিতাবাঘ, বন্যশুয়োর, বন্য কুকুর প্রভৃতি। ছোটো স্তন্যপায়ীর মধ্যে রয়েছে উড়ন্ত কাঠবেড়ালি, শজারু, প্যাঙ্গোলিন ইত্যাদি। সরীসৃপের মধ্যে কুমির, গোসাপ, গিরগিটি, পাহাড়ি অজগর, গোখরো। উদ্যানটি পাখিপ্রেমীদের জন্য স্বর্গরাজ্য, ২০০ প্রজাতির পাখি রয়েছে।

এসো সংস্কৃত শিখি-৭৯

क्रियापदस्य एकवचनं वहुवचनम् च – प्रथमपुरुषे

गच्छति -- गच्छन्ति

যায় (১জন) — যায় (অনেকজন)।

पठति -- पठन्ति

अभ्यासं कुर्म: --

बालक: गच्छति। बालका: गच्छन्ति।

गायक: गायति। गायका: गायन्ति।

छात्र: लिखति। ......।

युवक: .....। .... धावन्ति।

शिक्षक: .....। ..... पाठयन्ति।

प्रयोगं कुर्म:--(নিজে নিজে বাক্য রচনা করতে হবে)

गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, वदति, हसति, पश्यति, धावति।

ভালো কথা

ঝালমুড়ি

সেদিন স্কুল ছুটির পর আমি আমার বন্ধু সৌমীকে খুঁজছিলাম। এদিক ওদিক তাকাতেই ঝালমুড়ি কাকুর কাছে ওকে দেখতে পেলাম। ও এক ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি মনে মনে ভাবলাম টিফিনের সময় তো আমরা একসঙ্গে ঝালমুড়ি খেয়েছি, এরমধ্যেই ওর আবার খিদে পেয়ে গেল। ও আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বলল, দেখবি আয়। তারপর একটু বাইরে এসে দেখলাম একটা পাগলি বসে আছে। সৌমী তার হতে ঠোঙাটা দিল। পাগলিটা ওর দিকে একটু খানি দেখে নিয়ে খেতে শুরু করল। সৌমী বলল, ও কথা বলতে পারে না। আমি বললাম, কবে থেকে দিচ্ছিস? সৌমী বলল, আজই প্রথম।

রত্না চক্রবর্তী, অষ্টম শ্রেণী, খাতড়া, বাঁকুড়া।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ক অ ট নু

(২) থ অ র না

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) বা ল মু তা ধ্য ক

(২) ভ বা ল লি সু কা

৪ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) ভোগবিলাস (২) শ্রাবণধারা

৪ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) পুরাণকাহিনি (২) ধূলিধূসরিত

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, ইবি, মালদা। (২) সমীর দাস, গোবরডাঙ্গা, উ: ২৪ পরগনা। (৩) স্বপ্না রায়, বোলপুর, বীরভূম। (৪) শিবাণী সরকার, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ, উ: দিনাজপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT
8240685206
9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

ভোটার তালিকা সংশোধনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপত্তি কেন?

ভোটার তালিকা সংশোধিত হলে ধরা পড়বে রোহিঙ্গারা। দেশজুড়ে 'রোহিঙ্গা খেদাও' অভিযান শুরু হয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী টেনশনে ভুগছেন। কারণ রোহিঙ্গারা এবং বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা তাঁর ভোটব্যাংক।

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে বিধানসভার নির্বাচন হবে পশ্চিমবঙ্গে। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। Special Intensive Revision সংক্ষেপে SIR বিহারে শুরু হয়ে গেছে। তারপর পশ্চিমবঙ্গে হবে। ভারতের সব রাজ্যেই করা হবে। ভোটার তালিকা সংশোধন ইতিপূর্বে বহুবার হয়েছে, এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এই সংশোধনের ঘোর বিরোধী।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২৪ বলেছে— "In order to supervise the entire procedure and machinery for election and to appoint Election Tribunals and for some other ancillary matters the constitution provides for an independent body, namely the Election Commission (Art 324). The Provision for the removal of the Election Commissioners make them independent of Executive control and ensure an election free from the control of the party in power for the time being.'

ভোটার লিস্ট ত্রুটিমুক্ত হওয়াই কাম্য। যারা পশ্চিমবঙ্গের পাট চুকিয়ে অন্যত্র চলে গেছে, অথবা একাধিক স্থানের ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে, অথবা যে সব ভোটার পরলোকগত, তাদের নাম বাদ দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান এবং রোহিঙ্গাদের ভোটার হিসেবে গণ্য করা হবে না, কারণ তারা অবৈধভাবে, চোরাপথে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর বৈধ ভোটারদের থেকে অবৈধ ভোটারদের বেশি দরকার, তাই তিনি এসআইআর-এর বিরোধিতা করছেন, বলছেন একজনেরও নাম কাটতে তিনি দেবেন না। ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে শুধু ভোটার লিস্ট নিয়ে কথা বললেন, তাও হিন্দিতে, বললেন, 'এক ভি নাম কাটনে নেহী দেঙ্গে, ইলেকশন কমিশনকো ঘেরাও করেঙ্গে' ইত্যাদি। এত তাঁর বাঙ্গালি প্রীতি হঠাৎ গজিয়ে ওঠা, 'বাঙ্গালি অস্মিতা' নিয়ে এত চীৎকার, অথচ মঞ্চ থেকে হিন্দি ভাষায় বক্তব্য রাখছেন, এ কি ধরনের দ্বিচারিতা? এখন বাঙ্গালি এই ভণ্ডামি বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে।

অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাতে পশ্চিমবঙ্গ ছেয়ে গেছে। তারাই তৃণমূলের প্রধান ভোটার। এটা কোনো গণতান্ত্রিক দেশ সমর্থন করে না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সবই সম্ভব। ২০০২ সালেও এসআইআর হয়েছে, তখন কোনো গণ্ডগোল হয়নি।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য এগারোটি নথি প্রয়োজনীয় বলে জানিয়েছে যার মধ্যে যে কোনো একটি থাকলেই ভোট দেওয়া যাবে, যেমন,

১. পৌরসভা, পঞ্চায়েত বা অন্য কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা বার্থ সার্টিফিকেট।

২. ২০০২ সাল বা তার আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রক দ্বারা দেওয়া পাসপোর্ট।

৩. স্বীকৃত বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট।

৪. সরকার দ্বারা জারি করা পরিচয়পত্র বা পেনশন অর্ডার।

৫. ডিএম বা ওই লেভেলের কর্তৃপক্ষ দ্বারা দেওয়া স্থায়ী বাসস্থান বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট।

৬. বন-অধিকার সার্টিফিকেট।

৭. সরকারি এসসি/এসটি/ওবিসি সার্টিফিকেট।

৮. এনআরসি ডকুমেন্ট (যেখানে প্রযোজ্য)।

৯. ব্যাংক বা পোস্ট অফিসের অ্যাকাউন্ট-এর পাসবুক।

১০. সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা পারিবারিক নথি।

১১. সরকারি সংস্থা দ্বারা প্রদত্ত জমিবাড়ির সংশাপত্র।

এছাড়া ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম ছিল

ফঃ ৬

কিনা, নিজের না থাকলে বাবা মায়ের নাম থাকলেও সে ভোট দিতে পারবে।

হিন্দু লোকজন যারা বাংলাদেশে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসছে, তারা ভারতের আইন অনুযায়ী শরণার্থী, তারা নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারী, তারা অনুপ্রবেশকারী নয়।

ভোটার তালিকা সংশোধিত হলে ধরা পড়বে রোহিঙ্গারা। দেশজুড়ে 'রোহিঙ্গা খেদাও' অভিযান শুরু হয়েছে, তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী টেনশনে ভুগছেন। কারণ রোহিঙ্গারা এবং বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা তাঁর ভোটব্যাংক।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে ১২ লক্ষ রোহিঙ্গাকে মায়ানমারে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করছে ইউনুস সরকার, আর এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিচ্ছেন। বসিরহাট থেকে ধৃত বাংলাদেশি, একাধিক জায়গা থেকে এখন ধরা হচ্ছে এদের। আরুফা খাতুন হয়েছেন রীতা মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে এসে। অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরা পশ্চিমবঙ্গে ঢুকছে। হিন্দু নাম নিয়ে বেশ বুক ফুলিয়ে থাকে, জনতার মধ্যে মিশে যায়। তাদের কাছে নকল ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, নকল পাসপোর্ট সবই পাওয়া যায়, যদি ধরা পড়ে।

সম্প্রতি সন্দেশখালিতে নকল টাকা, পরিমাণ সাত কোটি পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় রোহিঙ্গারা জড়িত। এরা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজকর্ম করেই রোজগার করে। পশ্চিমবঙ্গে ৫৪০ কিলোমিটার সীমান্ত অঞ্চল কাঁটাতারহীন, খোলা বর্ডার। মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় সরকার বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও জমি দেননি। ওই খোলা সীমান্ত দিয়েই বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গারা অনুপ্রবেশ করে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তাদের ধরে। তারপর নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় পুলিশের কাছে এদের হ্যান্ড ওভার করে। তারপর শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত দালালচক্র এদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র (নকল) দিয়ে দেয় মোটা টাকার বিনিময়ে। সম্প্রতি বারাসতের এক তৃণমূল নেত্রী রত্না বিশ্বাস খোলাখুলি এক জনসভায় বলেছেন যে, 'এখানে অনেক বাংলাদেশি রয়েছে, আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না, জাকিরদা আপনাদের ভোটার কার্ড করে দেবেন, এই কাজটা জাকিরদা খুব ভালো করেন, সামনে নির্বাচন, আমরা চাই একটা ভোটও যেন বাইরে না যায়।'

ভারতের পার্লামেন্টে 'ইন্ডিয়া জোট' এসআইআর-এর বিরোধিতা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলও পার্লামেন্টে জোটের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাউস উত্তাল করেছে। এরা কী চায়? যারা মৃত, তাদের নামও থাকবে? গত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিখ্যাত গায়ক, প্রয়াত দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের নামেও ভোট পড়েছিল। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান গায়ক, তাই বিষয়টা মানুষের গোচরে আসে। সাধারণের ক্ষেত্রে জানতেও পারা যায় না যে কতজন মৃত ভোটার প্রেতাত্মার রূপ ধরে এসে ভোট দিয়ে গেল।

সম্প্রতি কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেছেন পশ্চিমবঙ্গে কোনো রোহিঙ্গা নেই, 'নাক চ্যাপটা হলেই রোহিঙ্গা হয় নাকি?' সম্প্রতি বাগদা থেকে রেজাউল মণ্ডল নামে এক বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর সন্ধান পাওয়া গেছে যে তার শাশুড়িকে মা সাজিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলে বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছিল। সে ছিল বাংলাদেশের একজন বরিষ্ঠ বিএনপি নেতা। পরে বড়ো ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যায় বাংলাদেশে, পরিস্থিতি সেখানে অনুকূলে আসার পর।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এখনো নিজেকে একজন বিরোধী নেত্রী মনে করেন। তাই প্রতি পদে পদে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করাই তাঁর প্রধান কাজ। আজ তিনি অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের জন্য গলা ফাটাচ্ছেন অথচ ২০০৫ সালে সংসদে ঘোষণা করেছিলেন যে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি ২০ লক্ষ ভুয়া ভোটার আছে যারা সিপিএম-এর ভোটব্যাংক। এই কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রমাণের নথিপত্র হিসেবে একগুচ্ছ কাগজের বান্ডিল স্পিকারের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। আজ তিনি ক্ষমতায় আসীন, তাই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে উলটো সুর গাইছেন, অবৈধ ভোটারদের তিনি কিছুতেই নাম কাটতে দেবেন না বলেছেন।

একটা কথা না বললেই নয়, আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হঠাৎ করে বাঙ্গালি অস্মিতা, বাংলা ভাষা নিয়ে কত না কথা বলছেন। মিথ্যা বলার প্রতিযোগিতায় তাঁর সঙ্গে কেউ পারবে না। তিনি বলেছেন বাংলা ভাষায় কথা বললেই নাকি ভিনরাজ্যে লোকজনকে ধরপাকড় করা হচ্ছে, বাংলাদেশি বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, অকথ্য অত্যাচার করছে, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা জামাইবাবুকে 'দুলাভাই', জলকে পানি, নিমন্ত্রণকে দাওয়াত, ফুফু, খালা, গোসল, গোস্ত, নাস্তা ইত্যাদি শব্দ কখনোই ব্যবহার করে না। বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাঙ্গালি হয় না। আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ইংরেজিতে কথা বলে, ইংরেজি তাদের প্রধান ভাষা, তার মানে কি আমেরিকানরা, কানাডিয়ানরা, অস্ট্রেলিয়ানরা সবাই ইংরেজ? সবাই ব্রিটিশ?

বাঙ্গালি শুধু বাংলা বললেই হয় না। বাঙ্গালি একটি জাতিসত্ত্বা, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দোল-দুর্গোৎসব, ভাইফোঁটা, জামাইষষ্ঠী, রাখিবন্ধন, শঙ্খধ্বনি, পয়লা বৈশাখের হালখাতা, পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্র জয়ন্তী। বাঙ্গালি একে অপরকে নমস্কার জানায়, গুরুজনদের প্রণাম করে। কখনো 'সালাম আলাইকুম, আলাইকুম সালাম' বলে না। পশ্চিমবঙ্গে ওপার বাংলা থেকে দেশভাগের পরে ১৯৭১-এর পরে যে সব বাঙ্গালি পালিয়ে এসেছিলেন, তারা অনেকেই বাঙ্গাল ভাষায় কথা বলতেন। কেউ কেউ এখনো বলেন পারিবারিক ক্ষেত্রে, কিন্তু তাদের ভাষায় কিন্তু 'দুলাভাই' ইত্যাদি শব্দ একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশের বাংলা ভাষার আরবীকরণ হয়ে গেছে, আরও হবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের বাংলার আরবীকরণ হয়নি, যদিও চেষ্টা চলছে প্রশাসনের তরফে। রামধনু এখানে রংধনু হয়ে গেছে, আকাশ হয়েছে আসমান।

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন হিন্দুর সব আছে, নেই শুধু একতা। আজ তাঁর বাণীর গুরুত্ব বাঙ্গালি বুঝতে পেরেছে, তাই আজ হিন্দুজাগরণ দিকে দিকে দেখা যাচ্ছে। হিন্দু সংগঠিত হচ্ছে ক্রমশ। হিন্দু ভোট জোট বাঁধছে দেখে মুখ্যমন্ত্রী ভীত। তাই এখন ভাষার ভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যারা গেছেন কাজ করতে, তিনি তাদের বিপদে ফেলছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে যারা বাংলায় কথা বলছে, তাদের ধরে ধরে জেলে পোরা হচ্ছে, তারা নাকি সাংঘাতিক ভাবে অত্যাচারিত হচ্ছে, বাংলায় যারা কথা বলছে, তাদের সবাইকেই নাকি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে ধরা হচ্ছে। কথাটি সর্বৈব মিথ্যা। ওইসব রাজ্যের বাঙ্গালিরা জানাচ্ছে যে তারা খুবই ভালো আছেন, কাজ করে রোজগার করছেন, পশ্চিমবঙ্গে কাজ নেই, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে কোনো দিনই ফিরতে চান না। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে বলছেন, এর উত্তরে তাঁরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে

ফিরলে খাব কী?' আসলে সবটাই ভোট টানার খেলা।

তৃণমূলের নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন সিপিএমের দাপুটে নেতা, পরে বিতাড়িত) জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে পশ্চিমবঙ্গের বাদুড়িয়ার বাসিন্দা আবু বক্কর মণ্ডল, বয়স ৩৩, শুধু বাংলায় কথা বলার জন্য তাকে মেরে ফেলা হয়েছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। ঋতব্রত এটাও বলেছেন যে আবু বক্কর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কথা বলতেন। সঙ্গে সঙ্গে মুম্বই পুলিশের এসিপি আদিনাথ বুধওয়ান্ত পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন। আসল ঘটনা হলো এই হত্যার তদন্তে জানা গেছে যে এর পশ্চাতে রয়েছে পরকীয়া প্রেম। এর সঙ্গে ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই।

মুখ্যমন্ত্রী একটি গুজব তৈরির কারখানা বানিয়েছেন এই রাজ্যে। তিনি ভয় পেয়েছেন এটা ভেবে যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা তাঁকে আর পছন্দ করছেন না, সম্ভবত তাঁরা আগের মতো তৃণমূলকে ঢেলে ভোট দেবেন না, তাই তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে অন্যান্য রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা বাংলায় কথা বলার জন্য নির্য্যাতিত হচ্ছে। সেই কারণে তাদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে বলছেন। এদের সংখ্যা প্রায় বেয়াল্লিশ লক্ষ, এরা পরিযায়ী। এদের পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসতে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী, বলছেন 'আমি আপনাদের কাজ দেব, থাকার জায়গা না থাকলে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করে দেব, চলে আসুন।' এখন তাঁর দরকার আমদানি করা দুধেল গাই।

নানা ধরনের ভুয়ো ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করা হচ্ছে। জনৈক পার্থপ্রতিম রায় জুলাইয়ের ২৩ তারিখ একটি ভিডিয়ো পোস্ট করলেন হরিয়ানাতে বাঙ্গালিরা নাকি প্রচণ্ড মার খাচ্ছে। পরদিনই সেই ভিডিয়ো অদৃশ্য হয়ে গেল। ফেসবুক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি লিখেছেন যে, কিছুক্ষণ আগে তিনি জেনেছেন এটা ফেক ভিডিয়ো, তাই এটা তিনি ডিলিট করে দিলেন। এই তো অবস্থা।

রোহিঙ্গারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। মায়ানমারের রাখাইন প্রদেশে এরা থাকত। পরে এদের নানা ধরনের গুন্ডামিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওখানকার মানুষ আরাকান আর্মির সাহায্যে দেশছাড়া করে ওদের। ওরা বাংলাদেশে ঢোকে, তারপর সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড সবই কিনে নেয়, তৃণমূলের ভোটার হয়ে যায়। এদের মধ্যে কোনো গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাবে না, কোনো সরকারি কর্মচারী পাওয়া যাবে না। এরা নানা ধরনের সমাজ বিরোধী কাজকর্মে পটু, মারদাঙ্গা করে অন্যের, বিশেষ করে অমুসলমানদের জমি দখল করে আসল জমি বা বাড়ির মালিককে মেরে বা উৎখাত করে। কলকাতার মহানাগরিক এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বারুইপুরে, কাকদ্বীপে, এমনকী শহর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় এদের ক্যাম্প করে রাখা হয়েছে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুলিশ-প্রশাসন কিছুই জানে না? একথা কেউ বিশ্বাস করবে?

এছাড়া বারাসাত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত রেললাইনের পাশে রেলের জমিতে এদের ক্যাম্প করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরা শাসকদলের ভোটার। তাই এদের জামাই আদর। কলকাতার মধ্যে 'গুলশন কলোনি' তৈরি হয়ে গেছে। জলা জমি অবৈধ ভাবে ভরাট করে প্রমোটিং হয়েছে, চার তলা, পাঁচ তলা বিল্ডিং গায়ে গায়ে তৈরি হয়ে গেছে প্রশাসনের সহায়তা। সেখানে অবৈধ বাংলাদেশি আর রোহিঙ্গারা সপরিবারে বসবাস করছে। কত হাজার রয়েছে কেউ জানে না। মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে চুপ। তিনি পুলিশমন্ত্রী কিন্তু তাঁর পুলিশ ওই এলাকায় যেতে ভয় পায়। শহর কলকাতায় রাজাবাজার, এন্টালি, পার্কসার্কাস, বেকবাগান, খিদিরপুর, ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, মোমিনপুর, চিৎপুর আরও বহু এলাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নিয়েছে, ওই সব এলাকা প্রায় হিন্দুশূন্য।

সল্টলেকের বিভিন্ন এলাকায় রোহিঙ্গাদের ডেরা। এরা শাসকদলের ভোটার। সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রীর এসআইআর-এর বিরোধিতা। যদি পশ্চিমবঙ্গের বৈধ ভোটারদের দ্বারাই আপনি তিনবার পরপর জিতে এসেছেন, তাহলে এসআইআর-এ আপনার এত ভয় কেন? কেন বলছেন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে এলে নির্বাচন কমিশনকে ঘেরাও করবেন, ছৌ নাচ দেখাবেন, ধামসা মাদল বাজাবেন, মহিলাদের হাতা খুন্তি ব্যবহারের কথা বলছেন কেন? এটা কি জেহাদিদের প্রশ্রয় দেওয়া নয়? তিনি কি পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে চান? ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশ নাক গলাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত চলছে? মনে হয়, অনেকেই বলছে যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জর্জ সোরোস ও মহম্মদ ইউনুসের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন। কথাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন হবে। শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগে তৈরি হিন্দু বাঙ্গালির নিরাপদ আশ্রয় এই পশ্চিমবঙ্গ জেহাদি জামাতিদের দখলে চলে যাবে, তাদের অবস্থা হয়ে যাবে কাশ্মীরি হিন্দুদের মতো নিজভূমে পরবাসী।

কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম তো পাকিস্তানি সাংবাদিককে গর্বের সঙ্গে বলেছেন, ''আমি তো কলকাতায় 'মিনি পাকিস্তান' বানিয়ে দিয়েছি।'' তিনি একথাও সাম্প্রতিককালে বলেছেন ভবিষ্যতে এ রাজ্যে ৫০ শতাংশ মানুষ উর্দুতে কথা বলবে।

বাংলাদেশে তথাকথিত বাঙ্গালিরাই সত্যজিৎ রায়ের ময়মনসিংহের পৈতৃক বাড়ি ভেঙে ফেলেছে, ঋত্বিক ঘটকের রাজশাহিতে বাড়িও ভেঙে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ, ঢাকার লোক ছিলেন। প্রফুল্ল সেন খুলনার, বিধানচন্দ্র রায়ও খুলনার, সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় ঢাকার, জ্যোতি বসুও ঢাকার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ফরিদপুরের আদি বাসিন্দা ছিলেন। অধীর চৌধুরীও পাবনার মানুষ। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও অনেকেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা মানুষ। সুনীল গাঙ্গুলি মাদারীপুর থেকে, মহাশ্বেতা দেবী পাবনা থেকে, মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য চাটুকার সঙ্গীত শিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী বরিশাল থেকে পালিয়ে আসা লোকজনের অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গে এসে তারা সিউডো-সেকুলার হয়ে গেছেন। কেন তাঁরা পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল পশ্চিমবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করলেন, সেকথা তারা ভুলেও বলেন না। বাংলাদেশে এখন যে অমানুষিক অত্যাচার চলছে হিন্দুদের উপর, সে বিষয়ে এরা কিন্তু টুঁ শব্দ করেন না, প্রতিবাদ তো দূরের কথা। এদের মনুষ্যত্ব বিক্রি হয়ে গেছে, এরা বুদ্ধিজীবী নয়, এরা মানবতাহীন ভাতাজীবী।

প্রেতাত্মা ও ছদ্মবেশী অবৈধ ভোটারদের জন্য এসআইআর-ই ওঝা। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ঘুম উড়ে গেছে। তাই রোহিঙ্গাদের, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোট তাঁকে পেতেই হবে। তিনি ভুলে গেছেন যে তিনি কিন্তু সংবিধানের ঊর্ধ্বে নন, ভারতের আইন কানুন মানতে তিনি বাধ্য, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন না। আশা করি শীঘ্রই তাঁর মনে শুভবুদ্ধির উদয় হবে। □

১৮৫৭ সালের মতো সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাতে চেয়েছিলেন রাসবিহারী বসু

প্রণব দত্ত মজুমদার

১৯১২ সালে ২৩ ডিসেম্বর, ভাইসরয় হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের পরে ব্রিটিশের পুলিশ প্রথমে কোনোকিছুর হদিশ করতে পারেনি। পরে ১৯১৩ সালের মে মাসে লাহোরে বসন্ত বিশ্বাস— পঞ্জাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে বোমা মারায় যখন দেখা যায় সেই বোমার মশলার সঙ্গে ভাইসরয়কে মারা বোমার মশলার মিল পাওয়া যাচ্ছে তখন সেই সূত্র ধরে একে একে বড়োলাটকে বোমা মারার সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। শুরু হয় দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা। একে দিল্লি-লাহোর ষড়যন্ত্র মামলাও বলা হয়। ওই মামলায় আমীর চাঁদ, বালমুকুন্দ, অবোধবিহারী এবং বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম হয়। এই ভয়বহ ঘটনার মূল মাথা হিসেবে রাসবিহারী বসুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলো; কিন্তু রাসবিহারীকে ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। ছদ্মবেশে সুদক্ষ রাসবিহারী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এই সময় ১৯১৩ সালে কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া ও উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া সানফ্রানসিসকো অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয় অভিবাসীরা বিশেষত শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা তৈরি করেছিলেন একটি বিপ্লবী সংগঠন। এটি 'গদর' পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রথমে এটি লালা হরদয়াল এবং সোহন সিংহ ভাকনার নেতৃত্বে 'যুগান্তর আশ্রম' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্য কার্যালয় ছিল— 436, Hill street San Francisco। এরা একটি সাপ্তাহিক কাগজ বের করতেন উর্দু, পঞ্জাবি ও গুরুমুখী ভাষায়, যার নাম ছিল The Gadar। এই কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার একদম উপরে যে ক্যাপশন লেখা থাকত তা হলো— 'বন্দে মাতরম' এবং 'আংরেজী রাজ কা দুশমন' যা থেকে এঁদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা যায়। এদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা এবং ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসনকে উচ্ছেদ করা। ক্রমে এই কাগজের জনপ্রিয়তা কানাডা বা উত্তর আমেরিকার ভারতীয়দের মধ্যেই শুধু নয় তা ছড়িয়ে পড়ে থাইল্যান্ড সিঙ্গাপুর, ম্যানিলা, মালয় ইত্যাদি স্থানে। এই কাগজের মাধ্যমে প্রবাসী অনেক ভারতীয় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন এবং এই কাগজের নামেই এই প্রতিষ্ঠান পরিচিত হয়ে যায় 'গদর পার্টি' বলে। গদর শব্দের অর্থ বিপ্লব বা বিদ্রোহ।

গদর পার্টির কার্যকলাপে ব্রিটিশের গোয়েন্দা বিভাগ এঁদের ব্যাপারে খুব সন্ধিহান হয়ে উঠল এবং পঞ্জাবিদের উপরে বর্ণবৈষম্যমূলক অমানবিক ব্যবহারের মাত্রা বাড়তে লাগলো। এদের প্রবেশ ঠেকাবার জন্য ব্রিটিশের প্রভাবে কানাডিয়ান সরকার অশ্বেতকায় মানুষদের ওদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দিল। এ ব্যাপারে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে।

১৯১৪ সালের ২১ জুলাই, বাবা গুরদিৎ সিংহ নামে এক পঞ্জাবি ব্যবসায়ী 'কোমাগাতা মারু' নামে একটি জাপানি জাহাজ ভাড়া করে প্রায় ৩৭৬ জন যাত্রী নিয়ে যাদের মধ্যে ৩৪০ জন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন, কানাডার ভাঙ্কুভার গিয়ে পৌঁছুলেন। কিন্তু ওই জাহাজ থেকে কাউকে নামতে দেওয়া হলো না। জাহাজটিকে লোকজন-সহ বন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো; শুধু তাই নয় ফেরবার পথে সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি ব্রিটিশ প্রভাবিত কোনো বন্দরেই কোনো ভারতীয়কেই খাবার দাবার ওষুধপথ্য ইত্যাদি ব্রিটিশ প্রভাবিত কোনো বন্দরেই কোনো ভারতীয়কেই খাবার দাবার, ওষুধপথ্য ইত্যাদি জরুরি দ্রব্য সংগ্রহের প্রয়োজনেও নামতে দেওয়া হল না। ওদের সন্দেহ ছিল এদের মধ্যে গদর পার্টির লোকজন আছে।

অবশেষে ২৯ সেপ্টেম্বর 'কোমাগাতা মারু' জাহাজটি কলকাতার বজবজে এসে নোঙর করে। প্রায় ছ' মাস ধরে জাহাজে একরকম বন্দি থাকা যাত্রীরা একটু বাইরে বেরিয়ে খাবারদাবার খেয়ে বিশ্রাম করে যে যার নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যাবেন এরকমই ভেবেছিলেন যাত্রীরা। কিন্তু ব্রিটিশের পুলিশ তাদের বাইরে যেতে দিল না। ঠিক হলো তাঁদেরকে পঞ্জাবগামী একটি ট্রেনে সরাসরি তুলে দেওয়া হবে। কেউ কেউ রাজি হলেও; শিখ সম্প্রদায়ের কিছু লোক ঠিক করেছিলেন সঙ্গে আনা তাদের পবিত্র গ্রন্থ 'গুরু গ্রন্থসাহিব' মাথায় করে স্থানীয় গুরু দ্বারাতে নিয়ে গিয়ে সাধনভজন করে তবে যাবেন। ইংরেজের পুলিশ তাতেও বাদ সাধল। গুরদিৎ সিংহ ওদের বাধা না মেনে 'গুরু গ্রন্থসাহিব'কে মাথায় নিয়ে হাঁটা লাগালেন নিকটবর্তী গুরু দ্বারার দিকে। বহু শিখ তার পিছন পিছন চলতে লাগলো। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। তাদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। অবশেষে পুলিশ গুলি চালিয়ে দিল। দুজন পথিক-সহ প্রায় ১৮ জন যাত্রী মারা গেলেন। শিখদের মধ্যে দু' একজন গদর পার্টির লোক হয়তো ছিল। এবং তাঁদের কাছে পিস্তল ছিল। তাঁরাও গুলি চালিয়ে দিলেন। দুজন ইংরেজ অফিসার-সহ একজন ভারতীয় কনস্টেবল মারা গেলেন। প্রায় ২০০ জন যাত্রীকে গ্রেপ্তার করে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। গুরদিৎ সিংহ ও তাঁর কিছু অনুগামী হইহট্টগোলের মধ্যে পালিয়ে গেলেন। 'কোমাগাতা মারু'র এই ঘটনা শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। এই খবর গিয়ে পৌঁছল কানাডার গদর পার্টির কর্মকর্তাদের কাছে। তাঁরা খুব রেগে গেলেন এবং এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন।

১৯১৪ সালের জুলাই মাস নাগাদ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘোষণা হয়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহে সোহান সিংহ ভাকনা ঠিক করলেন তিনি তার পার্টির বিপ্লবীদের নিয়ে ভারতে চলে আসবেন এবং এখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে সমন্বয় করে ইংরেজ শক্তিকে আঘাত হানবেন। ইংরেজ সেনাবাহিনীতে প্রচুর শিখ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। গদর পার্টির বিপ্লবীরা তাঁদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে এবং অনুপ্রাণিত করে ইংরেজদের আঘাত হানবার

পরিকল্পনা করছিলেন। এই কাজে তাঁদের একজন দক্ষ নেতার প্রয়োজন ছিল। সেইসময় পঞ্জাব, লাহোর ইত্যাদি অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে বেশ ভালোরকমের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল রাসবিহারী ও তাঁর বিপ্লবী সংগঠনের। গদর আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। রাসবিহারীর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কুশলতার কথা বিশেষ করে বড়লাটকে বোমা মারার কথা তাঁরা অবগত ছিলেন। তাই তাঁরা রাসবিহারীর নেতৃত্ব অনায়াসে মেনে নিলেন।

এদিকে পুলিশ যখন ভাইসরয়কে বোমা মারার ব্যাপারে রাসবিহারীকে খুঁজছিল তখন তিনি চন্দননগরে চলে এসেছিলেন। বিভিন্ন ছদ্মবেশে তিনি গোপনে তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি যোগাযোগ করেন 'যুগান্তর' দলের বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির (বাঘা যতীন) সঙ্গে, বিখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জির সঙ্গে। তাঁরা গোপনে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতে মিলিত হয়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মতো ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সিপাহিদের অনুপ্রাণিত করে গদর পার্টির সহায়তায় একটি সশস্ত্র সেনাবিদ্রোহ ঘটাবার পরিকল্পনা করেন।

ফরাসি কলোনি চন্দননগরে রাসবিহারীর গোপন আস্তানায় একদিন ব্রিটিশের পুলিশ হানা দিল। সারা বাড়ি ঘিরে ফেলা হলো। কিন্তু কোথায় রাসবিহারী। আসলে পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই পালিয়েছিলেন সুদক্ষ অভিনেতা রাসবিহারী বসু। ব্যাপারটা ছিল এই রকম— তখন মফস্‌সল শহরে খাটাপায়খানা ছিল যেখানে বড় বড় গামলায় মলমূত্র জমা হতো এবং সেখান থেকে মলমূত্র বিশেষ ধরনের ঢাকনা দেওয়া লোহার বালতি করে মেথররা বয়ে নিয়ে যেত। সকালে পুলিশ যখন বাড়ি ঘিরে ফেলেছে তখন পুলিশ দেখল— ময়লা কাপড়চোপড় পরা একটি মেথর মল মূত্রের বালতি মাথায়, হাতে ঝাড়ু নিয়ে বেরুচ্ছে। ময়লার দুর্গন্ধে ছিটকে সরে গেল পুলিশ, দু-চারটে গালি দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলল। এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত ছদ্মবেশে তিনি বহুবার পুলিশ ও গোয়েন্দাদের বোকা বানিয়েছিলেন।

তিনি যখন দেখলেন চন্দননগরে তাঁর উপর ব্রিটিশ পুলিশের নজর পড়েছে তখন তিনি পালিয়ে কাশী (বারাণসী) চলে গেলেন। বেনারস কেন্দ্রে বিখ্যাত বিপ্লবী শচীনন্দ্রনাথ সান্যাল অনুশীলন সমিতির আখড়া গড়ে আগে থেকেই বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলছিলেন। ১৯১১-১২ সাল থেকেই শচীন সান্যালের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ক্রমে শচীন সান্যাল রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়ে উঠেছিলেন। শচীন সান্যালের সহায়তায় বারাণসীতে আত্মগোপন করে তিনি গদর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। তিনি ছদ্মবেশে লাহোর, মিরাট পঞ্জাব ইত্যাদি অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সশস্ত্র বিদ্রোহের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

সানফ্রান্সিসকোতে 'যুগান্তর আশ্রমে' হরদয়ালের সহকারী ছিলেন সাহসী তরুণ কর্তার সিংহ সারাবা। তিনি গদর পার্টির বহু সদস্যকে নিয়ে এসে রাসবিহারীর সঙ্গে যোগ দিলেন। ড. ভগবান সিংহ গিয়ানি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় দশ হাজার গদর পার্টির সদস্যকে অনুপ্রাণিত করে ভারতে পাঠান। এগিয়ে আসেন দুরন্ত সাহসী মারাঠি যুবক বিষ্ণু গণেশ পিংলে। এই সশস্ত্র বিদ্রোহের ব্যাপারে বঙ্গের বিপ্লবীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন রাসবিহারী— চন্দননগরের মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, শ্রীশ ঘোষ, উত্তরপাড়ার বিপ্লবী অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি, নলিনীকিশোর গুহ প্রমুখর সঙ্গে যোগাযোগ করে কী কী করণীয় তার নির্দেশ দেন। বিশেষ করে যুগান্তর দলের বিখ্যাত নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বাঘা যতীন)-কে অনুশীলন সমিতি-সহ পূর্ব ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত এবং বিপ্লবের জন্য তাঁদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব দেন। শচীন সান্যালকে বারাণসী থেকে ইউনাইটেড প্রভিন্সের বিপ্লবীদের সঙ্গে সমন্বয় করার দায়িত্ব দিয়ে রাসবিহারী নিজে চলে যান পঞ্জাব। সেখানে তাঁর ডান হাত ছিলেন মূলা সিংহ। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ওখানকার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তিনি।

লাহোরে হেডকোয়ার্টার বানিয়ে রাসবিহারী বিভিন্ন সেনা ছাউনিতে বিদ্রোহের প্রস্তুতির খবর নিতে লাগলেন। এ ব্যাপারে পিংলে ও কর্তার সিংহ রাসবিহারী ডান হাত এবং বাঁ হাত হয়ে উঠেছিলেন। পিংলে খবর দিলেন কলকাতার প্রায় পনেরো হাজার শিখ বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। বিভিন্ন সেনানিবাসের ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁদের বিদ্রোহের জন্য অনুপ্রাণিত করার দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো। এলাহাবাদের সেনাদলের দায়িত্ব দেওয়া হলো দামোদর স্বরূপকে, বারাণসীর ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হলো প্রিয়নাথ ও বিভূতি হালদারের উপর; বারাণসী এবং তার আশেপাশের ক্যান্টনমেন্টগুলিতে শচীন সান্যাল আগে থেকেই কাজ করছিলেন। জব্বলপুরের ভার নিলেন নলিনী মুখার্জি। আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, মীরাট ইত্যাদি অঞ্চলের সেনাছাউনিগুলোতে ঘুরে ঘুরে কাজ করতে লাগলেন কর্তার সিংহ ও পিংলে। জলন্ধরে ডোগরা রেজিমেন্টের মধ্যে কাজ করতে গেলেন হৃদয় রানা। পিয়ারা সিংহ, গোলাব

HEALTH CARE
Medmitra Bijonsikha Group
A-10/2, Purbadiganta, Santoshpur, Kolkata - 700 075
Mobile : +91 7980124001, E-mail : customercare@bijonsikha.com
Website : www.bijonsikha.com
Associated with manipalhospitals

আমরা বয়স্কদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি

- এছাড়াও আমরা বাড়িতে ডাক্তার / নার্স / ফিজিওথেরাপিস্ট / অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড়ে লিউপিন ডায়গনস্টিকস্ থেকে করিয়ে থাকি।
- সমস্ত রকম মেডিক্যাল যন্ত্র আমরা ভাড়ায় দিয়ে থাকি।
Oxygen Concentrator | Pulse Oximeters | Walkers
Suction Machine | Multi Parameter Monitors | Nebulizer
Wheelchair | Hospital Beds | Air Mattresses

আমরা বাড়িতে গিয়ে এই পরিষেবাগুলি দিয়ে থাকি —
Holter | ECG | Uroflometry | ABPM | EEG | EMG | NCV |
SSEP | RNS | BAER | VEP | PFT | PSG (Sleep Apnea) |
Portable Ventilator | ABPM

আমরা মাসিক ২,৯৯৯/- টাকার বিনিময়ে CGHS কর্মচারীদের বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে থাকি

- মুদিখানা বাজার - মাসে একবার
- ব্যাংক থেকে টাকা তোলা - মাসে একবার
- আপৎকালীন সময়ে হাসপাতালে ভর্তির সহযোগীতা
- ডাক্তারের চেম্বারে অথবা CGHS ডিসপেনসারীতে নিয়ে যাওয়া আসা - মাসে একবার
- CGHS ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ এনে দেওয়া - মাসে একবার
- ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় সমস্ত প্যাথলোজিক্যাল পরীক্ষার ওপর
- **৩ মাসের অগ্রিম টাকা দিলে দু'বার বাড়িতে ডাক্তার পরিষেবা বিনামূল্যে**

সিংহ ও হরনাম সিংহ নৌশেরা ও পেশোয়ারের দায়িত্ব নেন। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন সেনাছাউনি গুলিতে রাসবিহারীর পরিকল্পনা মতো বিপ্লবীরা ছড়িয়ে পড়েন। মিয়াঁ মির ও ফিরোজপুরের গোপন স্থানে বোমা তৈরির কেন্দ্র স্থাপিত হলো। এক কথায় বিপুল উদ্যমে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কাজ এগিয়ে চলতে লাগলো। বিপ্লবীরা গোপনে বিভিন্ন সেনানিবাসে বা সেনানিবাসের নিকটবর্তী গোপনস্থানে সেনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের দেশের স্বার্থে সশস্ত্র অভ্যুস্থানের জন্য অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কাহিনিও শোনানো হতো। শিখ ও হিন্দু সেনাদের মধ্যে বেশ ভালোরকম সাড়া পাওয়া গেল। তাঁরা দেশের জন্য বিদ্রোহ করার ব্যাপারে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।

দেশের প্রতিটি সেনাছাউনিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি সারা হয়েছে। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন ঠিক করা হলো— ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ঠিক হলো প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটান হবে লাহোরের 'মিয়াঁ মির' ক্যান্টনমেন্টে; তার সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থান ঘটান হবে রাউয়ালপিণ্ডি ও ফিরোজপুরে। সেই সংকেত পৌঁছে যাবে জব্বলপুর ও বারাণসীর ক্যান্টনমেন্টে এবং সেখানে অভ্যুত্থান ঘটবে এইভাবে সারা দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়বে। বঙ্গের ব্যবস্থাও করে রাখা হয়েছে সেখানকার সামরিক ঘাঁটিগুলোতেও সশস্ত্র অভ্যুত্থান করে তার দখল নেওয়া হবে। এখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, তখন দেশের সমস্ত সেনাছাউনিতেই ভারতীয় সিপাহিদের তুলনায় ইউরোপীয় সেনা ও অফিসারদের সংখ্যা ছিল খুবই কম, কাজেই ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটিয়ে সেনাছাউনির দখল নেওয়া অবাস্তব কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু ভারতে চিরকাল যা হয়ে এসেছে, যে কারণে ভারত বার বার বিদেশি শক্তির পদানত হয়েছে— সেই বিশ্বাসঘাতকতা। ১৩ ফেব্রুয়ারি খবর পাওয়া গেল— রাসবিহারীর একান্ত বিশ্বস্ত মূলা সিংহ প্রেপ্তার হয়েছেন। জানা গেল ছিপাল সিংহ নামক দলেরই একজন ইংরেজের গুপ্তচরের কাজ করছেন। তাঁকে ১৫ ফেব্রুয়ারি লাহোর স্টেশনে এক ইংরেজ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। রাসবিহারী প্রমাদ গুনলেন কিন্তু দমে গেলেন না। তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিন এগিয়ে করলেন— ১৯ ফেব্রুয়ারি। সম্ভবত সেই খবরটিও পেয়ে গিয়েছিলেন ছিপাল সিংহ এবং ইংরেজ অফিসারদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। কাজেই সিপাহীদের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ভারতকে ইংরেজ মুক্ত করার রাসবিহারীর পরিকল্পনাটিই ভেস্তে গেল।

লাহোর ক্যান্টনমেন্টে দেশীয় সিপাহিদের সরিয়ে দিয়ে ইউরোপিয়ান সেনা দিয়ে ভরিয়ে দেওয়া হলো। লাহোরের চারপাশে সন্দিগ্ধ এলাকাগুলোতে পুলিশের নজরদারি ও ধরপাকড় চলতে লাগল। লাহোরের যে গোপন আস্তানায় থেকে রাসবিহারী এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা এবং নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেখানেও পুলিশ হানা দিল। রাসবিহারী অবশ্য আগেই পালিয়ে বারাণসীতে চলে এসেছিলেন। কর্তার সিংহ প্রায় ৭০ জন সশস্ত্র বিপ্লবী নিয়ে ফিরোজপুর সেনাছাউনিতে পৌঁছে দেখেন ইংরেজ অফিসাররা আগেই খবর পেয়ে তার দখল নিয়ে নিয়েছে। পঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মাইকেল ও ডায়ার স্পেশাল এমার্জেন্সি জারি করে সন্দেহভাজন গদর বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করতে লাগলেন। পঞ্জাবের সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা অধিকাংশই ইংরেজ অনুগত ছিল। তাঁরা গদর বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন।

এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে কর্তার সিংহ, ভাই পরমানন্দ-সহ প্রায় একষট্টি জন নেতা ধরা পড়েন। ভারতরক্ষা আইনে বিচার করে চব্বিশ জনের ফাঁসির হুকুম হয় বাকিদের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ কর্তার সিংহ সারাবাকে ফাঁসি দিয়ে দিল ইংরেজ সরকার। এইভাবে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিশ্বাসঘাতকতার কারণে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। ওদিক থেকে যথা সময়ে সংকেত না আসার কারণে বঙ্গেও সশস্ত্র অভ্যুত্থান হতে পারল না। যে সব সেনা বা সিপাহি বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র করেছিল— এরকম যাদের শনাক্ত করতে পেরেছিল ইংরেজ অফিসাররা তাঁদের আউটরাম রোডে দাঁড় করিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হলো।

সিঙ্গাপুরের অবশ্য সিপাহিদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল। তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান, তাদের রাগের কারণ ছিল ভিন্ন। তাঁদেরকে ইংরেজ সরকার ঠিক করেছিল তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাবে; কিন্তু তুরস্কে তখন অটোমান সাম্রাজ্য এবং অটোমানের সুলতান তখন ইসলামি বিশ্বের খলিফা। খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁদের মজহব বিরুদ্ধ কাজ। কাজেই তাঁরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছিল। রাসবিহারী বা তাঁর সহযোগীরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়তো করেননি কিন্তু বৃহত্তর গদর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল এবং সশস্ত্র সেনা অভ্যুত্থানে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা ইংরেজ অফিসারদের মেরে শহরের দখল নিয়ে নিয়েছিলেন; প্রায় সপ্তাহখানেক সিঙ্গাপুর শহরের দখল তাঁদের হাতেই ছিল। কিন্তু মূল ভারত ভূখণ্ড থেকে বিদ্রোহের সংকেত না পেয়ে তাঁদের মনোবল ভেঙে যায় এবং ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

রাসবিহারীর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত পিংলে মিরাটে গ্রেপ্তার হলেন। রাসবিহারী বুঝলেন বারাণসীতে থাকাও আর নিরাপদ নয়। তিনি বেনারসের আস্তানা ছেড়ে চন্দননগর চলে এলেন। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশ তাঁর পিছনে লেগে থাকল। কয়েকবার তাঁদের চোখে ধুলো দিতে সক্ষম হলেও বিশ্বাসঘাতকদের সংখ্যাও তো কম নয় এদেশে। রাসবিহারীর একান্ত বিশ্বস্ত সহযোগীরা তাঁর আর এদেশে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না; তাঁরা তাঁকে বিদেশে চলে যেতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এই মর্মান্তিক পরিণতিতে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন তিনি। তিনিও উপলব্ধি করলেন এত বিশ্বাসঘাতকে ভরা ভারতভূমিতে থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করা যাবে না। ভারতের বাইরের কোনো শক্তির সাহায্য নিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কিন্তু কোথায় যাবেন? তাঁর চিন্তাভাবনায় এল জাপানের কথা।

এই সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো— সাহিত্যে এশিয়ার প্রথম নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপানে যাবেন। এই সুযোগটি সুচতুরভাবে কাজে লাগালেন রাসবিহারী বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক নিকট আত্মীয় মিস্টার পিএন টেগোরের নামে পাসপোর্ট বানালেন। পাসপোর্ট অফিসে একজন স্মার্ট সম্ভ্রান্ত বংশীয় ব্যক্তির মতো আচরণ করে বোঝালেন যে তিনি মিস্টার পিএন টেগোর, নোবেল লরিয়েট মিস্টার আরএন টেগোরের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি। তিনি আগে জাপানে গিয়ে বিশ্বকবির জন্য সব ব্যবস্থা ইত্যাদি করে রাখবেন তারপর কবি জাপানে যাবেন। তাঁর আচার আচরণে কথায় বার্তায় পাসপোর্ট অফিসের ইংরেজ অফিসারদের কোনো সন্দেহই হলো না। তাঁরা পাসপোর্ট দিয়ে দিলেন। ১৯১৫ সালের ১২ মে কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে রাসবিহারী বসু 'সানুকি মারু' নামে এক জাপানি জাহাজের প্রথম শ্রেণীর কেবিনের টিকিট কেটে জাপানের উদ্দেশে রওনা দিলেন মিস্টার পিএন টেগোরের ছদ্মবেশে। তারপরের ইতিহাস অন্য।

তথ্যসূত্র : ১. কর্মবীর রাসবিরাহী— অধ্যাপক বিজনবিহারী বসু। ২. বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু— মনোরঞ্জন ঘোষ। ৩. Revolutionaries-- Sanjeev Sanyal.

আরজি কর থেকে ল’ কলেজ : পশ্চিমবঙ্গ কি কিছু শিখেছে?

বিপ্লব বিকাশ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নারী সুরক্ষা নিয়ে শাসক দলের প্রতিশ্রুতি কোনো নতুন বিষয় নয়। বিশেষ করে যখন রাজ্যের নেতৃত্বে রয়েছেন একজন নারী। আশা ছিল নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা এ রাজ্যে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। কিন্তু বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই প্রতিশ্রুতি তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা কোনো সাধারণ অপরাধ ছিল না, বরং যা ছিল প্রশাসনিক ব্যর্থতা, রাজনৈতিক উদাসীনতা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার প্রতীক। এক বছর হয়ে গেলেও এত আন্দোলন করা সত্ত্বেও এই মামলায় কোনো বিচার হলো না।

গত বছর সেই রাতে তরুণী চিকিৎসককে নির্দয়ভাবে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় গোটা রাজ্য শিউরে উঠেছিল। কিন্তু ঘটনার তদন্তে ধীরগতি, প্রমাণ নষ্টের সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অপরাধীদের রক্ষা করার ইঙ্গিত— এই সবকিছুতেই নারী সুরক্ষা নিয়ে সরকারের আন্তরিকতা প্রশ্নবিদ্ধ। ন্যায়বিচারের জন্য সংঘটিত নবান্ন অভিযানে পুলিশি লাঠিচার্জ, অভয়ার মায়ের মাথায় আঘাত, বাবাকে হুমকি তুলে ধরেছে নাগরিক অধিকার উল্লঙ্ঘনের নগ্ন চিত্র। কত কষ্টের সঙ্গে সেই মা বলছেন, ‘আমিও ওর কাছে চলে যাব, কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়ব।’

কয়েক সপ্তাহ আগে ল’ কলেজ কাণ্ড যেন সেই ভয়াবহ স্মৃতির পুনরায় উন্মোচন। এক ছাত্রী, যিনি আইন পড়ে ভবিষ্যতে ন্যায়বিচারের রক্ষক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসে নিজ কলেজ প্রাঙ্গণেই যৌন নিগ্রহের শিকার হলেন। আশ্চর্যজনকভাবে, অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশি পদক্ষেপ শুরু দেরিতে এবং তাতেও রাজনৈতিক ছায়া।

সরকার নারী ক্ষমতায়ন ও নারী সুরক্ষার কথা বলে ভোটের ময়দান দাপালেও বাস্তব এর বিপরীত। মুখ্যমন্ত্রী নারী হলেও নারী সুরক্ষার নিশ্চয়তা বাস্তবে ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনের শীর্ষে থাকা ব্যক্তিরা নীরব ও রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করলে অপরাধীদের কাছে বার্তা যায় রাজনৈতিক সংযোগ তাদের রক্ষা করতে পারে। যদি আরজি করের বিচার দ্রুত সম্পন্ন হতো এবং আসল অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতো তাহলে কি এত সহজে ল’ কলেজে এক তরুণীকে তৃণমূল ছাত্রনেতা ধর্ষণ করার সাহস করতে পারত?

মানুষের মধ্যে তুমুল চর্চা চলছে যে, মুখ্যমন্ত্রী পর্দার আড়ালে থেকে আরজি কর মামলা ঠাণ্ডা করার জন্য এবং জনগণের রোষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বামপন্থীদের মাঠে নামালেন। লোকের যুক্তিটাও ফেলে দেওয়ার নয়। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে যে নবান্ন অভিযান হয়েছিল তার একদিন আগে মীনাক্ষী মুখার্জি ফেসবুক লাইভে এসে সেই অভিযানে যেতে বারণ করেন। কিন্তু জনগণের ভাবাবেগ আটকানো অসম্ভব। সকলে বুঝতে পারছিল দুই খেলোয়াড়ে খেলা খেলছে। অদ্ভুতভাবে ডাক্তারদের আন্দোলন থেমে যায়। যারা দলবদ্ধভাবে ইস্তফা দিয়েছিলেন তারা আজও সরকারি চাকরিরত কিনা? রাত দখল করে প্রতিরোধ তুঙ্গে তুলে আবার সব চুপ। কেন? তারপরেই কেন্দ্র-রাজ্য বিতর্ক উসকে দেওয়া, দিদি-মোদীর সেটিং বলে আসল কথাকে ঘুরিয়ে দেওয়া। কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করলে তে বাম-তৃণু সেটিং দেখা যাচ্ছে। কিছু বামপন্থী এনজিও, সেলিব্রিটি কমরেড এবং কিছু ডাক্তার সংগঠন আল তাকিয়া করে যাচ্ছে মানুষের ভাবাবেগকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই মা মেয়ের বিচার পাবেন কীভাবে, তা নিয়ে সত্যিই কি তারা চিন্তিত?

নারী সুরক্ষার প্রশ্নে পুলিশের ভূমিকা হওয়া উচিত ছিল নিরপেক্ষ ও দ্রুত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পুলিশি ব্যবস্থাকে প্রায়শই দেখা যায় রাজনৈতিক নির্দেশে পরিচালিত হতে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে লাঠিচার্জ, মহিলা আন্দোলনকারীদের উপর শারীরিক আক্রমণ এবং মেডিক্যাল রিপোর্টে সত্য গোপন এই সবই প্রমাণ করে যে, আইন রক্ষকদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব মারাত্মকভাবে কাজ করছে। পুলিশের উপর যে রাজনৈতিক চাপ রয়েছে জনগণের চোখে তা একদম স্পষ্ট। কলকাতা পুলিশ ফেসবুকে পোস্ট করলে তার কমেন্টে সেকশন দেখলে জনগণের মত যেন কিছুটা আন্দাজ করা যায়। গত ৯ আগস্ট আন্দোলন নিয়ে এফআইআর সম্বন্ধীয় গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দিতে করা পোস্টে অধিকাংশ লোকই হা হা রিয়্যাকশন দিয়েছেন। কলকাতা পুলিশকে নিজেদের পরিচয়টা স্পষ্ট করতে হবে। ‘মমতা ব্যানার্জির পুলিশ’ পরিচয় ঝেড়ে ফেলে কলকাতা বা রাজ্য পুলিশ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেই পরিচয়টা আজ কোথাও হারিয়ে গেছে।

আইন প্রয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করে পুলিশ ও তদন্তকারী সংস্থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে। চাপ যতই উপর থেকে হোক না কেন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাটা খুব জরুরি। বিচার ব্যবস্থায় গতি আনতে নারী নির্যাতন মামলায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিচার শেষ করার বিধান কার্যকর করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বজায় রাখতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য কড়া সুরক্ষা নীতি গ্রহণ করতে হবে। জনসচেতনতা ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমাজকেও নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য সদর্থক ভূমিকা পালন করতে হবে। কেবল সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না।

আরজি কর থেকে ল’ কলেজ, এই দুই ঘটনার মধ্যে কেবল সময়ের ব্যবধান আছে, ব্যবস্থার পরিবর্তন নেই। নারী সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা বাস্তবে প্রতিফলিত হবে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের নেতৃত্বে থাকার পরও যদি রাজ্যে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না হয়, তবে তা কেবল রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়, একটি সামাজিক বিপর্যয়! আরজি করের এবং ল’ কলেজের দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত হবে নাকি পরবর্তী মর্মান্তিক ঘটনার জন্য মানুষ অপেক্ষা করবে? এই প্রশ্নের উত্তর রাজ্যের জনগণকেই দিতে হবে, প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ও ন্যায়বিচারের দাবিকে অটুট রেখে।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩২

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

থাকছে

দেবীমাহাত্ম্য, উপন্যাস,
জীবনী, পুরাণ কথা,
বড়ো গল্প, ছোট গল্প
প্রবন্ধ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা